বার্চবনে ঝড়

শাহরিয়ার কবির

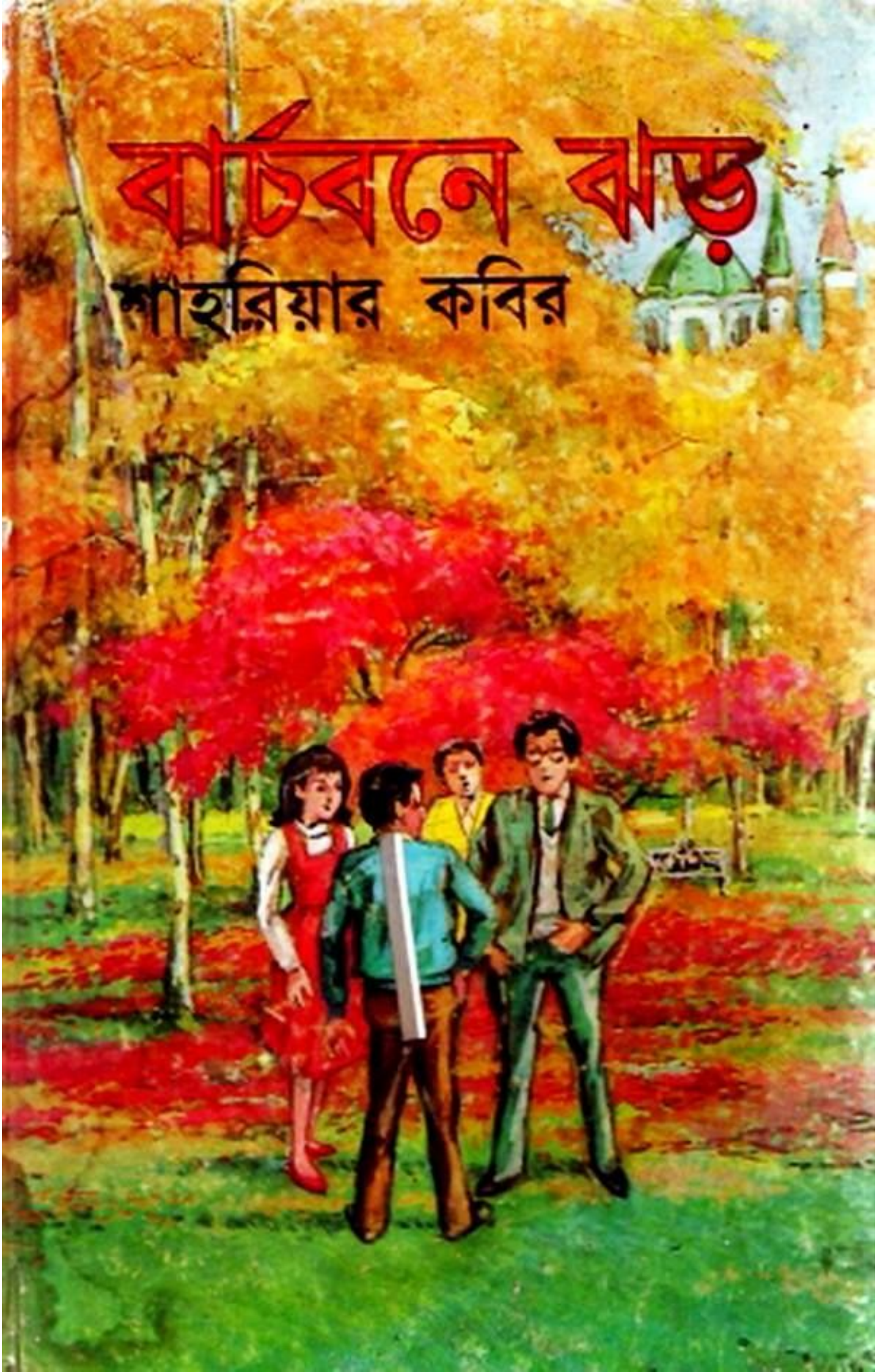

বার্চবনে ঝড়

রবিন — পলা
নীল
রীন

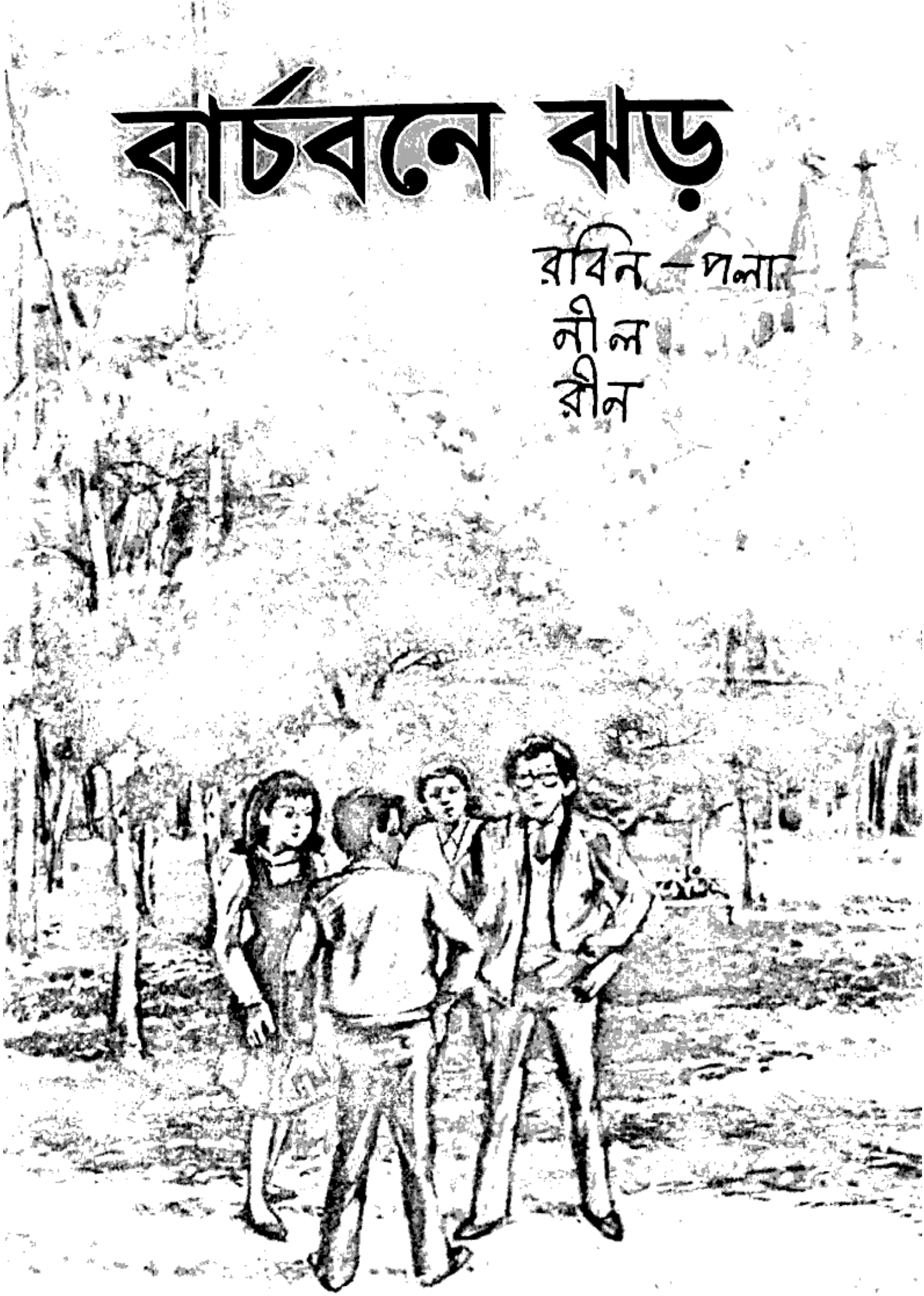

অলংকরণ : আবুল বারক আলভী

সোফিয়ায় গোলমাল

সোফিয়ার আমেরিকান স্কুলের বাইরের সিড়িতে বসে শেষ চুইংগামটা মুখে ফেলে রীন বললো, 'তোর কি মনে হয় শহরে খুব গোলমাল হচ্ছে?'

ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে নীল বললো, 'হেডমাষ্টার তো তাই বললেন। ব্রাদার এণ্ডারসন তোদের ক্লাসে যান নি?'

'না, সিস্টার আলবেনা এসেছিলেন। গোলমালের কথা কিছু বলেন নি। শুধু বললেন আজ দুটোয় স্কুল ছুটি হবে। ছুটির পর কেউ স্কুলে থাকবে না।'

বুলগেরিয়ায় এখন পাতাঝরার সময়। অক্টোবর শেষ হতে চলেছে। নভেম্বরের ভেতরই গাছের সব পাতা ঝরে যাবে। বুলেভার্ড রুসকিতে মস্ত বড় জায়গা জুড়ে পুরোনো আমলের এক বাড়িতে থাকে নীলরা। ওদের বাবা বুলগেরিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, তিন বছর হলো সোফিয়ায় এসেছেন। বাড়ির পেছনের আঙিনায় একশ' দেড়শ' বছরের পুরোনো বার্চ, চেস্টনাট, ওক, লিন্ডেন আর লাইম গাছ থেকে সারাদিন সারারাত সরসর করে পাতা ঝরে পড়ে। গাছের পাতাঝরার এ সময়টা নীলদের খুব ভালো লাগে। রাস্তার ওপাশে ফ্রিডম পার্কের ভেতর হাঁটতে গেলে শুকনো পাতায় পা ডুবে যায়। গাছের পাতা যে কত বিচিত্র রঙের হতে পারে ইউরোপে না এলে নীলরা জানতে পারতো না। ওক গাছের পাতা হয় অরেঞ্জ আর ব্রোঞ্জ রেড, লাইমের পাতা লেমন ইয়েলো, বার্চের পাতা ব্রাইট গোল্ডেন— রঙের আর শেষ নেই।

ওদের আমেরিকান স্কুলটা শহরের একপ্রান্তে, বুলেভার্ড টলবুখিন-এ, ভিতুশা পাহাড়ের ঠিক নিচে। এদিকটা খুব নিরিবিলি, শহরের কোনও কোলাহল এখানে এসে পৌঁছোয় না। নীলদের বাড়ি এখান থেকে কম করে হলেও তিন মাইল হবে।

নীল ঘড়ি দেখে বললো, 'তোবারক আলীর আসতে আরো এক ঘন্টা।'

সামারে ওদের স্কুল ছুটি হয় পাঁচটায়, উইন্টারে চারটায়। উইন্টার মানে অক্টোবর থেকে শুরু করে এপ্রিল পর্যন্ত। শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত-সবই এর ভেতর পড়ে। গাড়ির জন্যে কখনো বলতে হয় না। নীল আর রীন জানে ছুটির পর স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে তাকালেই দেখবে বুড়ো ওক গাছটার নিচে বাংলাদেশ দূতাবাসের কালো মার্সেডিয নিয়ে অপেক্ষা করছে ঝকঝকে সাদা ইউনিফর্ম পরা তোবারক আলী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ বছর হবে, চেহারা সিনেমার হিরোদের মত, বুলগেরিয়ানরা ওকে টার্কিশ

ছবির এক নায়ক ভেবে ভুল করে। সাত বছর ধরে সোফিয়ায় আছে, এত সুন্দর বুলগেরিয়ান বলে যে বোঝার উপায় নেই ওর আদি বাড়ি নোয়াখালির চরে। ইংরেজিও মোটামুটি বলতে পারে, তবে বাংলা বলার সময় নোয়াখালির টান আর গোপন থাকে না। রীন ওকে পাখিপড়ার মত শিখিয়েছে, 'আমাকে আফা বলবে না, আপা বলবে।' একবার দু'বার ঠিক মত বলেও আবার আগের মত—'আফা আফা' করবে, আপনি না বলে বলবে 'আমনে।' ভাইকে বলবে 'বাই'। নীল একদিন বলেছিলো, 'তোবারক ভাই, তোমার এই দারুণ হ্যাণ্ডসাম চেহারা নিয়ে ড্রাইভার হতে গেলে কেন, ঢাকার সিনেমায় নামলে নাম করতে পারতে।' তোবারক আলী চটপট উত্তর দিয়েছে, 'ফাইরতাম, কিন্তুক ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রব্লেম—।' শুনে নীল আর রীন হেসে গড়িয়ে পড়েছে। রীন তো কদিন ওকে 'মিঃ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রব্লেম' বলে খেপিয়েছিলো, মা'র বকুনি খেয়ে বন্ধ করেছে। তোবারক আলী অবশ্য ওদের রসিকতায় কিছু মনে করে না। ও জানে এই স্যারের ছেলে মেয়ে দুটো ওকে খুব ভালোবাসে, বেগম সাহেবও নিজের ঘরের লোকের মত ব্যবহার করেন। আগের স্যারের এক বিটকেল ছেলে ছিলো, পড়তো লণ্ডনে, ছুটিতে যখন আসতো তখন খাটিয়ে মারতো, কথা বলতো এমনভাবে তোবারক আলী যেন বাড়ির চাকর।'

চিবোনো চুইংগামটা ফেলে দিয়ে রীন বললো, 'শহরে গোলমাল যদি বেশি হয় তোবারক আলী আসবে কিভাবে?'

নীল গম্ভীর গলায় বললো, 'এম্ব্যাসির সিডি কার কেউ আটকাবে না।'

আমেরিকান স্কুলে নীলের এটা শেষ বছর, রীনের স্কুলে ছাড়তে আরো দু'বছর বাকি। ওদের এ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে, রীনদের বাকি একটা, নীলদের তিনটা। এখানে এসে ওরা খুবই ভালো করছে। এর আগে ছিলো বার্লিনে। ওখানকার চেয়ে এখানকার টিচাররা ভালো, খুব যত্ন করে পড়ান। বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের বড় বড় কূটনীতিকদের ছেলেমেয়েরা এ স্কুলে পড়ে। সবাই এখানে পড়তে পারে না, খরচ খুব বেশি। দূতাবাসের সাধারণ ষ্টাফদের ছেলেমেয়েরা লোকাল স্কুলে পড়ে, যেখানে পড়ার কোন খরচই লাগে না। স্কুল পর্যন্ত এখানে সব কিছু ফ্রি। দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি আলম সাহেবের ছেলে আতিক নীলের বয়সী, লোকাল স্কুলে পড়ে, ওদের চেয়ে অনেক ভালো বুলগেরিয়ান বলে। আতিকদের স্কুলে সব কিছু বুলগেরিয়ান ভাষায় পড়ানো হয়।

ব্যাগটা সিড়ির ওপর রেখে রীন উঠে দাঁড়ালো। শক্ত পাথরের সিড়ির ওপর এতক্ষণ বসে পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে। কয়েকবার পা ছুঁড়ে ধুপধাপ করে হেঁটে নীলকে বললো, আরেকবার টেলিফোন করে দেখ না দাদা!'

রীনকে একটু নার্ভাস মনে হলো। মৃদু হেসে নীল বললো, 'তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? বলি নি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কাজ করছে না! গোলমাল ওদের নিজেদের ভেতর, আমাদের কেউ কিছু বলবে না।'

রীন আসলেই ভয় পাচ্ছিলো— গন্ডগোলের ভেতর তোবারক আলী যদি আসতে না পারে! ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। এতক্ষণ বসে আছে, একটা বাসও চোখে পড়ে নি। সামনের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে ঝড়ের বেগে একটা দুটো গাড়ি ছুটে যাচ্ছিলো। নীল

ওর ভয় পাওয়াটা টের পেয়েছে দেখে রীন মুখ ভার করে বললো, 'ভয় আবার কখন পেলাম! সময় মত বাড়ি ফিরে না গেলে মা বুঝি ভাববে না!'

'তখন তো বললাম স্কুল বাসে যেতে। ভিড় দেখে যেতে চাইলি না। তোবারক আলী না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।'

'বাসে গেলে লাইব্রেরিতে যেতাম কিভাবে? বই ফেরত দিতে এমনিতে দুদিন দেরি হয়ে গেছে।'

'এই গোলমালে লাইব্রেরি কি খোলা থাকবে!'

'আচ্ছা দাদা, গোলমালটা কারা করছে বলতো?'

'বাবা সেদিন বললেন সিটিযেনদের কি একটা কমিটি নাকি হয়েছে, পোল্যাণ্ডের সলিডারিটির মত। ওরা এখানে ইলেকশন চাইছে। হতে পারে ওরাই রাস্তায় নেমেছে।'

'দাদা, এখানে কি কেউ মিছিল করলে বাংলাদেশের মতো পুলিশ গুলি করে?'

'পাগল হয়েছিস! ইউরোপ, আমেরিকায় এসব চলে না। ঝিভকভ যদি দেখে বেশির ভাগ মানুষ ওকে চাইছে না, তাহলে ঠিকই দেখবি গদি ছেড়ে দিয়েছে।'

মাত্র ষোল বছরে পা দিয়েছে নীল। ওর কথা শুনে মাঝে মাঝে রীন অবাক হয়ে যায়। ঠিক বাবার মত কথা বলে। এম্ব্যাসি থেকে বাবা যেসব ইংরেজি পত্রিকা আনেন নীল সব পড়ে। ক্লাসে বরাবরই ফার্স্ট হয়। বার্লিনে থাকতেও ক্লাসের ফার্স্টবয় ছিলো ও। নীলের ইচ্ছা বড় হয়ে বাবার মত কূটনীতিক হয়ে নানা দেশ ঘুরবে।

ঘড়িতে যখন সোয়া চারটা বাজলো রীন তখন না বলে পারলো না, 'দাদা আমার সত্যি ভয় করছে। তোবারক আলী যদি না আসে কি হবে! একটু পরেই তো সন্ধ্যা হবে।'

নীল শান্ত গলায় বললো, 'ভয় কী, আমি আছি তো! আর পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবো। তারপর এখানকার পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ওদের হেল্প চাইবো।'

ভিতুশা পাহাড় থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বয়ে গেলো। বৃষ্টির মত ওক আর লাইম গাছের পাতা ঝরে পড়লো, বাতাসে এলোমেলো উড়ে গেলো বহু দূর। ছাই রঙের একটা ম্যাপল পাতা উড়ে এসে রীনের ঘন কালো চুলে প্রজাপতির মত আটকে রইলো। ওরা কেউ দেখতে পেলো না।

ঠিক সাড়ে চারটায় ওরা যখন পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখনই ওদের চোখে পড়লো কালো মার্সেডিযটা। অন্য সময় এত স্পীডে গাড়ি চালালে তোবারক আলীকে জরিমানা করা হতো। সেদিন রাস্তায় দেখার মত কেউ ছিলো না। ওকে দেখে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। উত্তেজিত গলায় বললো, নেভস্কি স্কয়ার, সেপ্টেম্বর স্কয়ার সব জায়গা জাম হই গেছে। চাইরদিকে খালি মিছিল, আটকা ফড়ি গেছিলাম।'

নীল আর রীন উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে তোবারক আলী ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালালো। রীন বললো, 'শহরে কি খুব গোলমাল হচ্ছে তোবারক ভাই?'

তোবারক আলী বললো, 'এদেশের মানুষ কোনদিন মিছিল দ্যাখে নাই। খুব ঘাবড়াই গেছে। ফুলিসও বেদিশা হই গেছে।'

নীল মৃদু হেসে বললো, 'মনে হচ্ছে তুমিও ঘাবড়ে গেছো।'

তোবারক আলী গলা খুলে হাসলো— 'আমি ক্যান ঘাবড়ামু নীল বাই? আমারে কে কি কইরবো? আমি চিন্তা কইরছিলাম আমনেগো কথা। আধ ঘন্টা দেরি হইছে, থোড়া বহুত ফেরেশান তো হইবেনই।'

'আমরা মোটেই পেরেশান হই নি।'

রীন গম্ভীর হয়ে বললো, 'তুমি না হতে পারো দাদা, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

তোবারক আলী নরম গলায় বললো, 'আর ভয়ের কিছু নাই আফা। এই গাড়ি ছোঁয়ার সাহস কারো নাই।'

নীল বললো, 'তুমি কি আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাবাকে আনতে যাবে?'

ফাঁকা রাস্তা ধরে তোবারক আলী ঘুরপথে শহরে যাচ্ছিলো। নীলের কথা শুনে ওর মনে হলো স্যারকে আনার সময় হয়ে গেছে। বললো, 'আমনেগো অসুবিধা না হইলে ঘুরি যাই স্যাররে তুলি লই।'

নীল বললো, 'আমাদের অসুবিধে হবে না। তুমি বাবাকে তুলে নাও।'

রীন বললো, 'এম্ব্যাসিতে গিয়ে মাকে ফোন করতে হবে।'

এমন কিছু দেরি ওদের হয় নি। নীলের খেলা থাকলে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। নীল ওদের স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। তবে ফিরতে দেরি হলে মাকে বলে যায়। আজ যে দেরি হবে মাকে বলে নি, বলার কথাও ছিলো না। তাছাড়া শহরের গোলমালের কথা মা নিশ্চয় জানেন। মার জন্যে তাই রীনের খুব ভাবনা হচ্ছিলো।

বাংলাদেশ দূতাবাস ওদের ঠিক পথে পড়ে না। শহরের প্রায় মাঝখানে রাকৌস্কি স্ট্রিট-এ, গ্রানাইট পাথরের পুরোনো দিনের একটা দোতালা বাড়ি। কূটনীতিক আর সাধারণ ষ্টাফ নিয়ে জনা দশেক মানুষের দফতর। রাষ্ট্রদূত বসেন দোতালায়।

নীলরা দূতাবাসে এলে কখনো সরাসরি বাবার ঘরে যায় না। সুন্দরী, চটপটে এক তরুণী সেক্রেটারী আছে। ওর ঘরেই বসে। ইলিনার মত ফ্যাশন জানা বুলগেরিয়ান মেয়ে রীনের চোখে এখন পর্যন্ত পড়ে নি।

সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে নীল বুলগেরিয়ান ভাষায় বললো, 'শুভ সন্ধ্যা ইলিনা মিরকোভা। আশা করি ভালো আছেন?'

'শুভ সন্ধ্যা নীল, রীন। হাসিমুখে ইলিনা বললো, 'এখন পর্যন্ত ভালো আছি। তবে কতদিন ভালো থাকবো বলতে পারছি না।'

'শহরে গোলমালের কথা শুনেছি।' নীল বললো, 'খুব শিগগিরই এসব মিটে যাবে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' ইলিনা মাথাটা ওপরে নিচে দোলালো।

বুলগেরিয়ায় প্রথম এসে এভাবে মাথা দোলানো দেখে অবাক হয়েছিলো নীলরা। অন্য সব জায়গায় 'হ্যাঁ' বলার সময় যেভাবে মাথা দোলানো হয়, বুলগেরিয়ানরা সেভাবে মাথা দুলিয়ে 'না' বলে। আর 'হ্যাঁ' বলার সময় উল্টোটা করে। আগে এম্ব্যাসির বুলগেরিয়ান ষ্টাফদের এভাবে মাথা দোলানো দেখে ওদের খুব হাসি পেতো। এখন ওরাও বুলগেরিয়ানদের মত মাথা দোলায়।

'আপনি কোন দলে ইলিনা মিরকোভা?'

রহস্যময় হেসে ইলিনা বললো, 'তোমাদের কি মনে হয়?'

নীল বললো, 'আপনি সিটিযেন কমিটির সাপোর্টার।'

'ঠিক ধরেছো।' এই বলে ইলিনা বাবাকে ইন্টারকমে ওদের কথা জানালো।

'এখনই আসছি ইলিনা। ওরা ইচ্ছে করলে তোমার ওখানে বসে কফি খেতে পারে।' জবাব দিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।

ইলিনা বললো, 'আমি দু মিনিটে তোমাদের চমৎকার কফি বানিয়ে খাওয়াবো।'

রীন বললো, 'ধন্যবাদ ইলিনা মিরকোভা। আশা করি আপনিও সঙ্গী হবেন?'

ইলিনা হাসলো— 'অবশ্যই। আমারও এখন কফির সময়।'

ওরা আগেও ইলিনার বানানো কফি খেয়েছে। চমৎকার লাগে খেতে। বাইরের কফি শপের চেয়েও ভালো। কফি শেষ না হতেই বাবা এসে দরজায় উঁকি দিলেন— 'এই যে বুড়ো বুড়ি, স্কুল থেকে আসতে কোন ঝামেলা হয় নি তো?'

রীন হেসে বললো, 'না বাবা।'

ওদের এত সুন্দর ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও বাবা ওদের বুড়ো বুড়ি ডাকবেন। মা ঠিকই নীল আর রীন বলেন। অবশ্য বাবার মুখে বুড়ো বুড়ি শুনতে মজাই লাগে।

বাবা ইলিনাকে বললেন, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। শুনেছো নিশ্চয় বিকেলের পর থেকে বাস বন্ধ হয়ে গেছে।'

ইলিনা বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, 'কিভাবে বাড়ি যাবো ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলাম।'

ইলিনার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন বাবা। বুলগেরিয়ান ভাষা বাবা ভালো জানেন না। বরং মা ভালো শিখেছেন। বাড়িতে যে কাজের লোক এসেছে, এক বছরে একা একা বাজার করে সেও ভালো বুলগেরিয়ান শিখে গেছে।

ইলিনাকে নামিয়ে দিয়ে ওদের বাড়ি ফিরতে সাড়ে ছটা বাজলো। রীন ভাগ্যিস মনে করে ফোন করেছিলো। নইলে মা এতক্ষণে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিতেন।

নীলদের গাড়ি যখন বাড়ির বড় গেট-এর ভেতর ঢুকলো তখন ওরা দেখলো মা গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। তোবারক গাড়ি থামাতেই মা শুকনো হেসে নীলদের বললেন, ফোন করলে কি আর ভাবনা দূর হয়।' তারপর বাবাকে বললেন, 'আজ হঠাৎ কী হলো বলো তো!'

বাবা বললেন, 'কী আর হবে! ইস্ট ইউরোপের সব দেশে যা শুরু হয়েছে তাই।'

তোবারক আলী একটু ইতস্তত করে বাবাকে বললো, 'স্যার রাতে যদি কোন প্রোগ্রাম না থাকে, আমি চলে যাই?'

মা বললেন, 'তুমি কি ক্ষেপেছো তোবারক? এই গণ্ডগোলের ভেতর কোথায় যাবে? রাতে এখানে থেকে যাও।'

তোবারক আলী থাকে শহরের বাইরে, এম্ব্যাসির এক স্টাফের সঙ্গে। বাসে যাওয়া আসা করে। ও খুব চিন্তিত ছিলো এই শীতের রাতে এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে ভেবে। বেগম সাহেবের কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় ওর বুকটা ভরে গেলো।

মা বললেন, 'তোবারক, ছাদে গিয়ে টিভির এন্টেনাটা একটু ঠিক করে দাও।

ঠিকমত ছবি আসছে না।'

নীল বললো, 'টিভি ষ্টেশনে হামলা করে নি তো?'

বাবা হাসলেন— 'বুড়ো একটু বেশি বেশি ভাবিস। টিভি ষ্টেশনে কেন হামলা করবে? সরকার বদলের জন্য এসব দেশে ও ধরনের আন্দোলন হয় না।'

কথাটা নীলের মনঃপুত হলো না। ও কদিন আগে ভিসিআর-এ 'ডেঞ্জারাস লাইফ' ছবিটা দেখেছে। ফিলিপাইনে মার্কোসকে গদি থেকে নামানোর জন্য কী সাংঘাতিক সব ঘটনা ঘটেছে— দেখিয়েছে সাত ঘন্টার ওই ছবিতে। একবার দেখতে বসলে টিভির সামনে থেকে নড়া যায় না। ছবিটা দেখে ঢাকায় বড়কাকার ছেলে রবিনকে চিঠিতে লিখেছিলো। রবিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স-এ অনার্স পড়ে। এখন ওর সেকেণ্ড ইয়ার চলছে। নীলের চিঠির জবাবে রবিন লিখেছিলো— ছবিটা আমিও দেখেছি। তুই নিশ্চয় জানিস আমাদের দেশেও ওরকম একটা মার্কোস রয়েছে। ওকে ফেলার জন্য আমরাও সেরকম কিছু করতে যাচ্ছি।

নিজের ঘরে এসে ব্যাগ থেকে একটা ইশতেহার বের করলো নীল। টিফিনের সময় এসে গোপনে ওর বুলগেরিয়ান বন্ধু রিস্টো ওটা দিয়েছে। ওদের স্কুল থেকে খুব কাছে রিস্টোদের স্কুল। রিস্টোর বাবা ইঞ্জিনিয়ার, সিটিযেন কমিটির একজন নেতা। ইশতেহারটা ভাঁজ করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে চাপা গলায় রিষ্টো বলেছে, 'বাড়ি গিয়ে পড়বি। তোর বাবাকেও পড়তে দিবি।' এরপর রিস্টো আর দাঁড়ায় নি। আড়চোখে এদিক ওদিক দেখে চলে গেছে। নীল তখন খুব অবাক হয়েছিলো। রিস্টোর কাছে ও সিটিযেন কমিটির নাম একবার শুনেছিলো বটে। এই ইশতেহার আর শহরের গোলমালের কথা না শুনলে সিটিযেন কমিটির ব্যাপারটা ভুলে যেতে বসেছিলো নীল। রিস্টোর সঙ্গে প্রায় একমাস পর দেখা হলো। তারপর এই গোলমাল।

বুলগেরিয়ান ভাষায় লেখা রিস্টোর ইশতেহার পড়তে গিয়ে দু'বার হোঁচট খেলো নীল। তবু বুঝতে অসুবিধে হলো না। প্রেসিডেন্ট ঝিভকভ, তাঁর ছেলে আর মন্ত্রীদের দুর্নীতির বিবরণ দিয়েছে। গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর নির্বাচনের দাবি করেছে। মোটামুটি এতটুকু বুঝতে পারলো নীল।

ইশতেহার পড়তে গিয়ে চা খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলো সে। রীন এসে ডাকলো, 'দাদা, মা চা নিয়ে অপেক্ষা করছে, তুই ঘরে বসে আছিস কেন? ড্রেসও চেঞ্জ করিস নি!'

নীল একটু অপ্রস্তুত হলো— 'ঠিক আছে, তুই যা, আমি এক্ষুণি আসছি।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর মুখহাত ধুয়ে পোষাক পাল্টে নিচে ডাইনিং রুমে এলো নীল। মা, বাবা আর তোবারক আলী বসে চা খাচ্ছে। রীন লিভিং রুমে টেলিভিশন দেখছে।

এক টুকরো কেক ভেঙে মুখে দিয়ে নীল বললো, 'বাবা তুমি এদের সিটিযেন কমিটির খবর কিছু জানো?'

'কিছু খবর তো রাখতেই হয়।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাবা বললেন, 'ওদের খবর জানতে চাইছিস কেন?' নিজের এই বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ইকবাল আহমেদ খান।

'আজকের গোলমাল সম্পর্কে কোন লিফলেট পেয়েছো?'

'না তো? কেন?'

'এটা দেখো।' এই বলে ইশতেহারটা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিলো নীল।

ইশতেহার হাতে নিয়ে বাবা চশমা পরলেন। এক নজর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এ তো বুলগেরিয়ান ভাষায় লেখা। তোবারক, পড়ে বলো তো কী লিখেছে?'

নীলের চেয়ে তোবারক অনেক ভালো বুলগেরিয়ান জানে। বাংলাদেশ দূতাবাসে কোন বাঙালি ওর মত এ ভাষাটি রপ্ত করতে পারে নি। মাঝে মাঝে ও দোভাষীর কাজও করে। কোন রকম হোঁচট না খেয়ে গড়গড় করে ইশতেহারটা পড়ে কিছু কিছু শব্দ নোয়াখালির বাংলা আর ইংরেজি মিশিয়ে অর্থ বলে দিলো সে। নীল খুব উপভোগ করলো যখন ও অত্যাচারীকে 'হার্মাদ', দূর্বৃত্তকে একবার 'নটোরিয়াস', আরেকবার 'বিডাল'— এমনি সব শব্দ বললো।

বাবা সবটুকু শুনে বললেন, 'এটা কি আমার কাছে রাখতে পারি বুড়ো?'

নীল হাসলো— 'নিশ্চয়ই পারো। আমার পড়া হলে ওটা তোমাকে দিতে বলেছে রিস্টো।'

মা একটু চিন্তিত গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে গোলমাল বেশ কিছুদিন চলবে। এ সময় রবিনের আসাটা কি ঠিক হবে? বলে তো দিলাম আসতে!'

বাবা বললেন, 'আসুক না, অসুবিধে হবে না।'

নীল অবাক হয়ে জানতে চাইলো— 'কখন আসবে রবিনদা?'

মা বললেন, 'দুপুরে তোর বড় কাকা ফোন করেছিলেন। থাই এয়ার থেকে উনি যে টিকেটটা এবার পাবেন সেটা রবিনকে দেবেন। ও রোম হয়ে সামনের ছ তারিখে সোফিয়া পৌঁছবে।'

বড়কাকার ট্রাভেল এজেন্সির অফিস আছে ঢাকায়। বিভিন্ন এয়ার লাইন্স থেকে তিনি ফ্রি টিকেট পান। বেশির ভাগই দিয়ে দেন গরিব আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতদের ছেলেমেয়েদের, যারা টাকার অভাবে বাইরে পড়াশোনা বা চিকিৎসার জন্য যেতে পারছে না। নীল বহুবার রবিনকে লিখেছে— বড়কাকার এত ফ্রি টিকেট, একবার বেড়াতে আসো না কেন! রবিন জবাব দিয়েছে, যখন বাবা দেয়ার মত কাউকে পাবেন না তখন চেষ্টা করবো। মার কথা শুনে নীল বললো, 'এবার বুঝি বড় কাকা টিকেট দান করার মত কাউকে পান নি!'

মা মৃদু হাসলেন— 'রোমে কেউ পড়তেও যায় না, ট্রিটমেন্টের জন্যও যায় না।'

'রবিনদা এলে খুব মজা হবে মা। ওকে নিয়ে সারা বুলগেরিয়া ঘুরে বেড়াবো।'

নীলের উচ্ছ্বাস দেখে বাবা মৃদু হাসলেন— 'বুখারেষ্টে হাশিম ভাই আছেন। ইচ্ছে করলে বুখারেস্ট থেকেও ঘুরে আসতে পারিস।'

'তাহলে তো আরও মজা হবে বাবা। হাশিম চাচার ওখানে গেলে যা করেন না!'

রুমানিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হাশিম সাহেব বয়সে বড় হলেও নীলের বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। নীলরা দু'বার বেড়াতে গিয়েছিলো। হাশিম চাচা আর মঞ্জু চাচী নীল আর রীনকে নিজের ছেলেমেয়ের মত ভালোবাসেন।

রীন লিভিং রুম থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'মা, বাবা, আজকের খবর শুনে যাও। কাল

থেকে সব স্কুল কলেজে উইন্টার ভ্যাকেশন।'

খবর শোনার জন্য ওরা সবাই লিভিং রুমে এলো। শহরে এত যে গোলমাল তার কোনও খবরই নেই। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শীতের ছুটির কথা বললো।

রীন খুব খুশি। বললো, 'বাবা আমাদের পরীক্ষার কী হবে?'

বাবা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কী আর হবে। যে সাবজেক্ট বাকি আছে, সেমিষ্টারের নাম্বার এ্যাভারেজ করে রেজাল্ট দেবে।'

নীল বললো, 'আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা। যখন স্কুল খুলবে বাকিগুলো তখন দিতে হবে।'

রাতের খাবার সেরে ওপরে নিজের ঘরে আসার সময় নীল ড্রইংরুম থেকে টাইম আর নিউজউইক পত্রিকা দুটো নিয়ে এলো। আজই বাবা অফিস থেকে এনেছেন পড়ার জন্য। দু'দিন পর আবার ওগুলো অফিসে নিয়ে যাবেন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিদেশী পত্রিকাগুলো পূর্ব ইউরোপের ঘটনা ফলাও করে ছাপছে। নীল ভাবলো সোফিয়ায় আজকের মিটিং মিছিলের খবরও এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছে। ঘড়িতে দেখলো রাত দশটা বাজে। ঠিক তখনই দরজায় টোকা দিয়ে রীন গলা বাড়িয়ে বললো, 'দাদা তোর টেলিফোন।'

টেলিফোন বাজার শব্দ নীলও শুনেছিলো। এত রাতে ওকে কে টেলিফোন করলো! অবাক হয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই রিস্টোর গলা শুনলো। ও ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে যে জিনিসটা দিয়েছিলাম ওটা তোমার বাবাকে দিয়েছো?'

রিস্টো ওর সঙ্গে সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলে না। নীলের মনে হলো সম্ভবত টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সবাই ইংরেজি জানে না, সেটা ভেবে রিস্টো ইংরেজি বলছে। নীল এক শব্দে জবাব দিলো, 'দিয়েছি।'

'কাল কি তুমি স্কুলে আসবে? জানতে চাইলো রিস্টো?

'স্কুলে কেন যাবো?' স্কুল কলেজ সব বন্ধ— শোনো নি?'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে কী যেন ভাবলো রিস্টো। তারপর বললো, 'চার তারিখে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে?'

'আমাদের বাসায় আসবে, নাকি আমি যাবো তোমাদের বাসায়?'

'না বাসায় নয়। অন্য কোথাও বলো।'

'তানিয়াকে নিয়ে যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে হতে পারে।'

তানিয়া রিস্টোর বন্ধু। গত মাসে ও আর রীন ওদের দু'জনের সঙ্গে ভিতুশা পর্বতের চূড়ায় গিয়েছিলো বেড়াতে। নীলের কথা শুনে রিস্টো একটু ভাবলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে। পাঁচ তারিখ বিকেল চারটায়। তুমি একা আসবে।'

খুট করে লাইন কেটে গেলো। নীল বুঝতে পারলো না রিস্টো কাটলো, না এক্সচেঞ্জ থেকে কাটলো। চিন্তিত হলো— একা ওর সঙ্গে এমন কী গোপন কথা বলতে চায় রিস্টো? বিছানায় শুয়ে একবার রিস্টোর কথা ভাবলো। আরেকবার রবিনদার কথা ভাবলো। তারপর একসময় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো নীল। বাইরে তখন ঝির ঝির করে বার্চ, ওক আর চেস্টনাটের পাতা ঝরছে।

সোফিয়ার পথে রবিন

বহুদিন ধরে রবিনের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার পর বাবার সঙ্গে নেপাল গিয়েছিলো, তারপর আর কোথাও যাওয়া হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছে। চীন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র আছে কি নেই এ নিয়ে ওদের পাঠচক্রে তুমুল আলোচনা হয়। পোল্যাণ্ডে সলিডারিটির কাছে কমিউনিস্টরা হেরে যাওয়াতে ওর খুব মন খারাপ হয়েছিলো। নিখিলদা অবশ্য বলেছেন, 'পোলিশরা নামেই কমিউনিস্ট। এত বছর পরও যদি পার্টি মেম্বাররা গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে, ওদের কি কমিউনিস্ট বলা যায়!'

রবিনের তখন মনে হয়েছিলো ওসব দেশে একবার গিয়ে যদি দেখে আসতে পারতো কী হচ্ছে, তাহলে ওর বুঝতে সুবিধে হতো। বাড়িতে এ নিয়ে কিছুই বলে নি, তবু ওর মনের খবর বাবা ঠিকই জেনেছেন। সকালে নাশতার টেবিলে খেতে খেতে বললেন, 'কাল সোফিয়ায় তোমার মেজচাচীর সঙ্গে কথা বলেছি। রোমে আমার বন্ধু নাফিসার সঙ্গেও কথা বলেছি। তুমি রোম হয়ে সোফিয়া ঘুরে এসো। কানেকটিং ফ্লাইট দিতে পারতাম, নাফিসা বললো তোমাকে দু'তিন দিন রোমে বেড়িয়ে যেতে।'

রবিন উত্তেজিত হয়ে বললো, 'সত্যি বলছো বাবা? কবে যাবো?'

মৃদু হেসে বাবা বললেন, 'নভেম্বরের দু'তারিখে ফ্লাইট। কালই ইটালিয়ান আর বুলগেরিয়ান এ্যাম্বাসিতে গিয়ে ভিসা নিয়ে এসো। তোমার কাকা ওদের বলে দেবেন।'

টেবিলে ওরা মাত্র দু'জন। রবিনের কোন ভাইবোন নেই। খুব ছোটবেলায় মা মারা গেছেন। বাবা ওকে কখনো মা'র অভাব বুঝতে দেন নি। বাবার কথা শুনে রবিন অবাক হলো, খুশিও হলো। বললো, 'তুমিও চলো না বাবা। সেই কবে নেপাল গিয়েছিলাম!'

বাবা আগের মতো হেসে বললেন, 'তুমি তো জানো আমার অফিসের অবস্থা আগের মতো নয়। আগামী দু-তিন বছর মনে হয় না বাইরে যেতে পারবো। থাই এয়ার একটা টিকেট দিয়েছে, তুমি একাই ঘুরে এসো। একা যেতে নিশ্চয় অসুবিধে হবে না?'

রবিন একটু লজ্জা পেলো— 'আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি তোমার কথা ভাবছি বাবা। তুমি একা হয়ে যাবে।'

'তুমি কি চিরদিনের জন্যে যাচ্ছো? বেশি হলে দিন পনেরো থাকবে। আমার অসুবিধে হবে না। বাবুর্চি আছে, সোলেমানের মা আছে— তুমি আমার কথা ভেবো না।'

রবিন বাবার মুখের দিকে তাকালো। চশমার ভেতর দিয়ে দুটো স্নেহঝরা চোখ ওকে দেখছে। বাবার বয়স এখন পঞ্চাশ। এখনো কী সুন্দর দেখতে! স্বাস্থ্যও চমৎকার। রবিনের বন্ধুরা রসিকতা করে বলে, ওদের দেখে নাকি দুই ভাইয়ের মত মনে হয়। বাবার এক বছরের ছোট মেজকাকা, দেখে মনে হয় বাবার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়।

রবিন বুলগেরিয়া যাচ্ছে শুনে ওর বন্ধুরা ভীষণ উত্তেজিত হলো। নিখিলদা পই পই করে বললেন, 'কাকা এ্যাম্বাসাডর বলে অতিথির মত বাড়িতে বসে থেকো না। সব ঘুরে দেখবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবে। চোখ কান খোলা রাখবে। পারলে কাকাকে বলে পার্টির কোন নেতার সঙ্গে যদি কথা বলতে পারো ভালো হয়।'

ওর ফ্লাইট ছিলো রাতে। বাবার সঙ্গে ওর দুই বন্ধু এলো এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে। গত কয়েক দিন যাওয়ার প্রস্তুতি আর উত্তেজনায় সময় কিভাবে কেটেছে টের পায় নি। এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকে ট্রাভেল ট্যাক্স, এম্বার্কেশন ফি ইত্যাদি জমা দিয়ে, চেক ইন করে বোর্ডিং পাস নিয়ে যখন কাস্টমস-এর জন্য ভেতর ঢুকবে, তখন কাচের দরজার বাইরে নজর পড়তে থমকে দাঁড়ালো। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মত, চশমার ভেতর চোখ দুটো ছলছল করছে। ওকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে ম্লান হেসে হাত নাড়লেন। রবিনের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। হঠাৎ মনে হলো, বাবাকে ফেলে এই প্রথমবার একা কোথাও যাচ্ছে।

রোমগামী যাত্রীদের ইমিগ্রেশনের জন্য যাওয়ার ডাক এলো। হাত নেড়ে বাবাকে বিদায় জানালো রবিন। কান্না চেপে ভেতরে ঢুকলো। ও জানলো না প্লেন ছাড়তে যে দু'ঘন্টা দেরি হয়েছিলো সেই সময়টুকু বাবা এয়ারপোর্টেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিলো, হঠাৎ যদি রবিনের কোনও কিছুর দরকার হয়, যদি কোন বিপদ হয়! এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, রবিন ছাড়া এ পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

রবিনের প্লেন টেক অফ করে আকাশে উড়লো। ওটা দৃষ্টিসীমার বাইরে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার পরও যতক্ষণ শব্দ শোনা গেলো তিনি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রবিনের বন্ধুরা চলে গেছে। একা তিনি নিজের ছোট গাড়িটায় উঠলেন। নির্জন এয়ারপোর্ট রোড ধরে শহরে আসার সময় রোমে তাঁর পুরোনো বন্ধু নাফিসার কথা ভাবলেন। জাতিসংঘের এক দফতরের বড় ধরনের আমলা। বলেছে, এয়ারপোর্টে নিজে এসে রবিনকে নিয়ে যাবে। রোমে ওর কোনও অসুবিধে হবে না।

প্লেনের ভেতর রবিনের বসার জায়গা ছিলো সামনের দিকে, তবে জানালার ধারে আসন পায় নি। ওর বাঁ দিকে দুজন যাত্রী, তারপর জানালা। পাশে বসেছেন এক বুড়ো ইউরোপিয়ান। কিছুক্ষণ পর পরই উঠে— 'এক্সকিউজ মি', বলে পেছনে যাচ্ছিলেন। বুড়োদের অনেকে অবশ্য ঘন ঘন বাথরুমে যায়, কিন্তু সামনের বাথরুম কাছে থাকতে ইনি কেন পেছনের বাথরুমে যাচ্ছেন রবিন বুঝতে পারলো না। একবার বলেই ফেললো, 'আপনার অসুবিধে হলে আমার জায়গায় বসতে পারেন।' বুড়ো রাজী হলেন না— 'না বাছা, এ সিটটা আমি বেছে নিয়েছি। এখানেই আমি আরামে থাকবো।' এই বলে বুড়ো রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন— 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ধূমপানের অভ্যাস নেই। থাকলে তুমিও আমার সঙ্গী হতে।'

রবিনদের আসন ছিলো ধূমপানমুক্ত এলাকায়। বুড়ো ধূমপান করেন অথচ এখানে বসেছেন দেখে ও অবাক হলো। বললো, 'আপনি যখন ধূমপান করেন, তখন পেছনে বসলেই তো পারতেন?'

বুড়ো একগাল হাসলেন— 'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। পেছনে গিয়ে তো দেখো নি! ধূমপায়ীদের ধোঁয়ায় পেছনটা নরক হয়ে আছে।' চোখ পিট পিট করে ওর দিকে তাকিয়ে তিনি ধূর্ত গলায় বললেন, 'শোন, তোমাকে একটা বুদ্ধি দেই। যদি কখনো সিগারেট ধরো, প্লেনে উঠে ভুলেও স্মোকিং সিট-এ বসবে না। নন-স্মোকিং সিটে বসে আরামে যাবে পলিউশন মুক্ত হয়ে। সিগারেট টানতে ইচ্ছে করলে স্মোকিং যোন-এ গিয়ে টেনে আসবে, যেমনটি আমি করছি। হা, হা, হা।' বুড়োর ভাবখানা দেখে মনে হলো মহামূল্যবান একখানা গোপন কথা ওর কাছে ফাঁস করলেন।

বুড়োর হাসিটুকু শিশুর মত সরল। চোখ দুটো নিষ্পাপ, কৌতুকে ভরা। কথার ধরন দেখে বুড়োকে ভালো লেগে গেলো রবিনের। হেসে বললো, 'তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম সামনে এত কাছে বাথরুম থাকতে আপনি বার বার পেছনের বাথরুমে কেন যাচ্ছেন।'

'তুমি বুঝি তাই ভেবেছিলে? হা, হা, হা। না বাছা, আমার সুগার ঠিকই আছে। ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়ার দরকার হয় না।'

বুড়োর হাসির শব্দে তাঁর পাশের মাঝবয়সী আরবটার ঘুম ভেঙে গেলো। ভুরু কুঁচকে বুড়োর দিকে তাকালো। সেদিকে বুড়োর কোন খেয়ালই নেই। রবিনকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? রোমে?'

'রোম থেকে সোফিয়া যাবো বেড়াতে।'

'সোফিয়া যাবে?' একটু অবাক হয়ে বুড়ো বললেন, 'এ রুটে ভাড়া বেশি পড়ে নি? ইস্ট ইউরোপের প্যাসেঞ্জাররা তো ওদিক থেকে এ্যারোফ্লোটে আসে, ভায়া মস্কো। টিকেট অনেক সস্তা।'

'আমারটা কমপ্লিমেন্টারি টিকেট। তাছাড়া রোমেও দুদিন বেড়াবো। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রবিন।

'আমি— মানে আমিও রোমে যাবো।'

'আপনি কি ইটালিয়ান?'

'না না। আমাকে দেখে কি ফুটবল পাগল ইটালিয়ান মনে হয়? আমার নাম বরিস। লণ্ডনে থাকি। অক্সফোর্ডে এ্যানথ্রপলজি পড়াই। তুমি নিশ্চয়ই ভারতীয়?

'আমাদের পূর্বপুরুষরা এক কালে ছিলেন। আমি বাংলাদেশের নাগরিক।' এই বলে রবিন নিজের পরিচয় দিলো। বাংলাদেশের নামটা বরিসের অচেনা নয়। 'আহ বাংলাদেশ! আমি একবার গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর দেশ। তবে অনেক গরিব মানুষ দেখেছিলাম।'

নিজেদের দেশের বাইরে কেউ বাংলাদেশ সম্পর্কে খারাপ কথা বললে রবিনের রাগ হয়। বললো, 'কতগুলো পাজি বদমাশ দেশটাকে শাসন করতে গিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছে বলে আমরা গরিব। তাই বলে আমরা চিরকাল গরিব ছিলাম না। আপনি নিশ্চয় জানেন

দুশ বছর ধরে আপনার পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশ আর ইণ্ডিয়াকে কিভাবে শোষণ করেছিলো?' কথাটা বলে ওর মনে হলো একটু বেশি বলা হয়ে গেছে।

ওর কথা শুনে প্রফেসরের মুখে হাসি মিলিয়ে গেলো। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি লণ্ডনে থাকি বটে, তাই বলে জন্মসূত্রে আমি বৃটিশ নই। একটু থেমে বুড়ো বললেন, 'সোফিয়ায় কি কারো আমন্ত্রণে যাচ্ছো?'

রবিন বললো, 'আমার কাকা সোফিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তাঁর কাছেই বেড়াতে যাচ্ছি।'

কথাটা শুনে প্রফেসরের কপালে সামান্য ভাঁজ পড়লো। সেটা রবিনের চোখেও পড়লো। আর কোন কথা না বলে বুড়ো প্রফেসর কম্বলটা গায়ে টেনে চোখ বুজলেন।

শেষ রাতে প্লেন আলো ঝলমলে দুবাই এয়ারপোর্টে থামলো। ঘন্টা দেড়েক থামবে এখানে। সবাই হুড়মুড় করে নামলো এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে জিনিস কেনার জন্য। এখানে সব কিছু নাকি দারুণ সস্তা। রবিনের হঠাৎ খেয়াল হলো, বাবা মেজকাকা, চাচী আর নীল রীনের জন্য জিনিসপত্র কিনে দিয়েছেন বটে, নাফিসা আন্টির জন্য কিছু কেনেন নি। তবে ওকে হাত খরচের জন্য তিনশ ডলার দিয়েছিলেন। রবিন ডিউটি ফ্রি শপে অনেকক্ষণ ঘুরে চমৎকার গিফট বক্সে ভরা একটা পারফিউম কিনলো, ষাট ডলার দিয়ে। ভাবলো বাবা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলেন, শুনলে খুশিই হবেন।

রোমের লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে রবিনদের প্লেন যখন নামলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বিরাট এয়ারপোর্ট। রবিন ভেতরে ঢুকে দেখলো অনেকগুলো কনভেয়ার বেল্ট। কত নম্বরে ওর লাগেজ আসবে একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে ছুটলো সেদিকে। অনেকক্ষণ লাগলো ওর স্যামসনাইট সুটকেসটা খুঁজে বের করতে। ট্রলিতে করে গেটের দিকে যেতে যেতে ভয় হলো, যদি নাফিসা আন্টি কোন কারণে এয়ারপোর্ট না আসতে পারেন তাহলে বিপদেই পড়বে। বাবা ঠিকানা ফোন নম্বর দিয়েছেন ঠিকই, তবে এও বলে দিয়েছেন— রোমে অনেক চোর, বাটপার আছে। বাগে পেলে টাকা পয়সা জিনিসপত্র সব নিয়ে নেবে।

আস্তে আস্তে ট্রলি ঠেলে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে সামনে এগোচ্ছিলো রবিন। হঠাৎ চোখে পড়লো সাগর নীল জর্জেটের শাড়ি পরনে শ্যামলা রঙের হালকা পাতলা গড়নের একজন স্মার্ট ভদ্রমহিলা ওর দিকে এগিয়ে আসছেন। হাঁটার ভঙ্গিটা রাজকীয় এবং চেহারাও চোখে পড়ার মত। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তুমি নিশ্চয় রবিন?'

হেসে মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ওঁর সঙ্গে হাত মেলালো রবিন। বললো, 'আরো তো অনেক বাঙালি ছিলো, চিনলেন কিভাবে?'

অপূর্ব এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে নাফিসা বললেন, 'ছিলো, তবে তুমি ছাড়া আর কেউ তোমার বাবার মত দেখতে নয়। পথে কোনও অসুবিধে হয় নি তো?'

'না আন্টি। দুবাই ছাড়ার পর লম্বা এক ঘুম দিয়েছি। আপনি কখন এসেছেন?'

'ঘন্টা খানেক হবে। তোমার ফ্লাইট আসতে পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরি করেছে। চলো, বেরুনো যাক।'

রবিনকে নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে নাফিসা বললেন, 'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।'

রোমের আবহাওয়া ঢাকার মতই মনে হলো। বিকেলের নরম সোনালী রোদে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট সব ঝকঝক করছে। নাফিসার ধবধবে সাদা বিএমডব্লিউ গাড়িটা প্রায় নিঃশব্দে এসে রবিনের পাশে দাঁড়ালো। সুটকেসটা আর হাতব্যাগটা পেছনের সিটে রেখে ও সামনে বসলো। ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে তিনি গাড়ি চালালেন শহরের দিকে। রবিন জানতে চাইলো, 'এয়ারপোর্ট থেকে আপনার বাড়ি কতদূরে?'

'মাইল ছয়েক হবে।' সামনের দিকে চোখ রেখে নাফিসা বললেন, 'আমার এ্যাপার্টমেন্টটা শহর আর এয়ারপোর্টের মাঝামাঝি জায়গায়।'

ভিয়া লরেনটিনায় তাঁর চমৎকার সাজানো তিন রুমের এ্যাপার্টমেন্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো রবিন। বড় ড্রইং কাম ডাইনিংরুম, একটা বড় বেডরুম আর গেস্টরুম। কিচেন আলাদা বাথরুম দুটো। ড্রইং রুমের পাশে আর বেডরুমের পাশে বড় বারান্দা রয়েছে। এ্যাপার্টমেন্টটা পনেরো তলার ওপর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবিন রোমের আকাশসীমা দেখলো। এদিকটায় বাড়িঘর বেশ ফাঁকা। নাফিসা বললেন, 'এ জায়গাটা নতুন শহরের এক মাথায়। পুরোনো শহরে গেলে দেখবে ঢাকার শাঁখারি বাজারের মতো রাস্তাও আছে।'

বারান্দার চারপাশে অনেকগুলো ফুলগাছের টব। থোকা থোকা লাল, সাদা, জেরানিয়াম আর বেগোনিয়া ফুটে সারা বারান্দা আলো হয়ে আছে। রবিন বললো, 'জেরানিয়াম সাদা হয়— আমি জানতাম না।'

'তোমার বাগানের সখ আছে বুঝি!' মৃদু হেসে নাফিসা বললেন, 'তোমার বাবাও বাগান ভালোবাসেন।'

মোটাসোটা মাঝবয়সী একজন ইটালিয়ান মহিলা এসে রবিন আর নাফিসাকে দু'কাপ চা দিয়ে গেলেন। বারান্দায় রাখা চামড়ার গদি মোড়া চেয়ারে বসে রবিন বললো, 'বাবাকে আপনি কত দিন ধরে চেনেন?'

নাফিসা রবিনের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন নিষ্পাপ কৌতুহল ছাড়া ওর চোখে আর কিছুই নেই। মৃদু গলায় বললেন, 'তোমার বাবা যখন ইউনির্ভাসিটিতে পড়তেন তখন থেকে, আমি তাঁর দু বছরের জুনিয়র ছিলাম।'

রবিন অবাক হয়ে বললো, 'আপনাকে দেখে মনে হয় আপনার বয়স চল্লিশেরও কম। বেশি হলে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ।'

কোন কথা না বলে নাফিসা নিঃশব্দে হাসলেন। রবিন আবার বললো, 'আপনারা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন।'

ঘাড় সামান্য কাত করে নাফিসা বললেন, 'তুমি কিভাবে জানো?'

'বাবা বলেছেন।' জবাব দিলো রবিন— 'বাবার এ্যালবামে আপনার ছবি আছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নাফিসা বললেন, 'তোমার মা যখন মারা যান আমি তখন প্যারিসে ছিলাম। শেষবার ঢাকা গেলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরে। তোমাকে দু তিন বছরের বাচ্চা দেখেছিলাম। তোমার অযত্ন হতে পারে বলে তোমার বাবা আর

বিয়ে করলেন না।'

নাফিসা আন্টিকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিলো রবিনের। বাবার জন্য তাঁর মমতা দেখে আরো ভালো লাগলো। বাবা তাঁর অনেক কথাই রবিনকে বলেছেন। শুধু বলেন নি তিনি এখনো কেন বিয়ে করেন নি। একবার ভাবলো জিজ্ঞেস করে— পরে মনে হলো এতটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা ওর উচিৎ হবে না।

রবিনকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে নাফিসা নরম গলায় জানতে চাইলেন, 'চুপ করে আছো কেন? বাবার কথা ভাবছো?'

রবিন মৃদু হেসে বললো, 'বাবার কথাও ভাবছি, আপনার কথাও ভাবছি।'

'আমার কথা ভাববার কী আছে?'

'এরকম একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না? লোনলি ফিল করেন না?'

'সময় কোথায় ওসব ফিল করার! অফিস থেকে ফিরতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। কখনো পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে যাই, কখনো ওরা আসে। সময় পেলে বই পড়ি, ছবি দেখি। ওসব কথা থাক। চলো পুরোনো শহর থেকে তোমাকে ঘুরিয়ে আনি। নাকি বিশ্রাম নেবে কিছুক্ষণ?'

'প্লেনে যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। আপনার খারাপ না লাগলে আমি বরং খুশিই হবো।'

'তোমার সঙ্গে ঘুরতে আমারও ভালো লাগবে।' খুব আস্তে কথাটা বললেন নাফিসা।'

রবিন উঠে দাঁড়ালো— 'আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর তৈরি হচ্ছি।' এই বলে ওর ঘরে গেলো। চমৎকার সাজানো গেষ্টরুমে ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে ড্রইংরুমে এসে দেখলো নাফিসাও শাড়ি পাল্টেছেন। সাদা মুগাসুতোর কাজ করা একটা সাদা জর্জেটে তাঁকে দারুণ সুন্দর লাগছিলো। রবিনের চোখে মুগ্ধতা দেখে নাফিসা হাসলেন। বললেন, 'নীল জ্যাকেটটা তোমাকে খুব মানিয়েছে।'

'আপনাকে পরির মতো লাগছে আন্টি।'

হাসি চেপে নাফিসা বললেন, 'তুমি পরি দেখো নি। পরিরা আমার মতো কলো হয় না।'

'কে বললো আপনি কালো?'

'ঠিক আছে বাবা, এগুলো তর্কের বিষয় হতে পারে না। চলো বেরোই।' রবিনকে থামিয়ে দিয়ে নাফিসা কাজের মহিলাকে ইটালিয়ান ভাষায় কী যেন বললেন। তারপর রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দু'হাজার বছরের পুরোনো রোমের দিকে।

গাড়িতে যেতে যেতে যতগুলো পুরোনো নিদর্শন দেখা যাচ্ছিলো রবিনকে বুঝিয়ে বলছিলেন নাফিসা অভিজ্ঞ গাইডের মত। বইয়ের আর ভিউকার্ডের ছবিতে অনেক দেখা কলোসিয়ামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রোমাঞ্চিত হলো রবিন। নাফিসা বললেন, 'কাল দিনে এসে ভেতরে গিয়ে দেখো।'

রাতের রোম দেখে ঘরে ফিরতে ওদের নটা বাজলো। নাফিসা বললেন, 'নিশ্চয় তোমার খুব খিদে পেয়েছে।'

রবিন হেসে বললো, 'খুব নয়, আরেকটু পরে খাবো।'

'তাহলে একটা টমাটো জুস নাও। খিদে পাবে।' এই বলে নাফিসা ফ্রিজ থেকে কাগজের প্যাকেট বের করে ওকে লম্বা গ্লাসে টকটকে লাল ঘন টমাটো জুস ঢেলে দিলেন। নিজে নিলেন ছোট গ্লাসে।

হঠাৎ মনে পড়াতে রবিন— 'এক্ষুনি আসছি,' বলে ঘরে গেলো। হাত ব্যাগ থেকে দুবাই থেকে কেনা পারফিউমটা বের করে এনে নাফিসাকে দিলো— 'এটা আপনার জন্য।'

নাফিসা অবাক হয়ে পারফিউমটা নিলেন। দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমার বাবা দিয়েছেন?'

রবিনের মনে হলো বাবার কথা বললে নাফিসা আন্টি বেশি খুশি হবেন। বললো, 'হ্যাঁ, বাবা দিয়েছেন।'

ওঁর ঠোঁটের ফাঁকে হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললেন, 'আমি খুব অবাক হয়েছি রবিন।'

'কেন, অবাক হওয়ার কি আছে?'

'তোমার বাবা এখনো মনে রেখেছেন আমি ওপিয়াম ভালোবাসি।'

রবিন পারফিউম ব্যবহার করে না। ওটার নাম যে ওপিয়াম আগে খেয়াল করে নি। দেখতে ভালো লেগেছিলো আর দাম দেখে মনে হয়েছিলো জিনিষটা খারাপ হবে না, তাই কিনেছিলো। ওর ভাবতে ভালো লাগলো পারফিউমটা নাফিসা আন্টির ভালো লেগেছে।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে নাফিসা ওকে ডাকলেন। ইটালিয়ান মহিলাটি রান্না সেরে সাতটায় চলে যান। রবিন অবাক হয়ে দেখলো টেবিলে সব দেশী খাবার— ভাত, ডাল, নিরামিষ, রুই মাছ রান্না আর মুরগি। বললো, 'আমি তো ভেবেছিলাম ইটালিয়ান খাবার খাবো।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে নাফিসা বললেন, 'কাল করতে বলবো। আমিও মাছ, ভাত সব সময় খাই না। মেহমান এলে করতে বলি। বাঙালিরা সব সময় বাইরে গিয়ে দেশী খাবার খোঁজে কিনা— '

রবিন বললো, 'ইংরেজিতে প্রবাদই তো আছে রোমে গেলে রোমানদের মত হও।'

নাফিসা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল থেকে তোমাকে রোমান বানিয়ে দেবো।'

খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ টেলিভিশন দেখলো রবিন। খবর হচ্ছিলো ইটালিয়ান ভাষায়। নাফিসা বাংলায় বলে দিচ্ছিলেন। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া আর হাঙ্গেরিতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ। পূর্ব জার্মানী থেকে দলে দলে মানুষ বর্ডার পেরিয়ে অস্ট্রিয়া হয়ে পশ্চিম জার্মানীতে যাচ্ছে। নাফিসা বললেন, 'বুলগেরিয়ায় বেড়ানোর জন্য তুমি ভালো সময়ই বেছে নিয়েছো। এই গণ্ডগোলের ভেতর না গিয়ে বরং ইটালীতে বেড়িয়ে যাও। তুমি চাইলে স্পেন থেকেও ঘুরিয়ে আনতে পারি।'

রবিন একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমি এই গণ্ডগোলটা কাছে থেকে দেখতে চাই আন্টি। বুঝতে চাই কেন এসব হচ্ছে।'

'কেন হচ্ছে এরা তো বলছেই। শুনলে না, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মুক্ত

জীবন— এসবের জন্য তারা একটা চেঞ্জ চাইছে।'

'এদের মুখ থেকে নয়— সুযোগ যখন পেয়েছি নিজে গিয়ে দেখবো।'

নাফিসার মনে হলো, রবিনের চেহারা দেখে যে রকম ছেলেমানুষ মনে হয় আসলে ও তা নয়। ঠিক ওর বাবার মত। খবর শেষ হওয়ার পর হাতে রোমের গাইড বুক ধরিয়ে দিয়ে ওকে ঘুমোতে পাঠালেন তিনি। নিজে অন্ধকারে একা বারান্দায় বসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সেই দিনগুলোর কথা ভাবলেন। কি চমৎকার ভাবনাহীন আনন্দময় দিন ছিলো সে সব!

পরদিন সকালে রবিন একাই ঘুরতে বেরুলো। যদিও নাফিসা বার বার বলছিলেন, 'আমার অসুবিধে হবে না। টেলিফোনে অফিসে বলে দিচ্ছি আজ যাবো না।' রবিন রাজী হয় নি। বলেছে, 'কোথাও গিয়ে একা ঘুরতে আমার ভালো লাগে আন্টি। কাল যে বইটা দিলেন ওতে রোমের গাইড ম্যাপ আছে, দেখার মত জায়গাগুলোতে কোত্থেকে কিভাবে যেতে হবে, কিভাবে দেখতে হবে সবই বলা আছে। আমি তো বাচ্চা ছেলে নই।' নাফিসা খুশি হয়েছেন রবিনের আত্মবিশ্বাস দেখে। জোর করে ওর পকেটে পঞ্চাশ হাজার লিরা গুঁজে দিলেন। ওকে বুঝিয়ে দিলেন বাস আর পাতাল রেলের টিকেট কিভ''ব কাটতে হয়। শুনে একটু অবাক হলো রবিন। বাসের টিকেট বাসে উঠে কেনা যায় না, স্টেশনারি দোকান থেকে কিনতে হয়।

রোমের ভেতর ভ্যাটিকান সিটি। পাতাল রেলে আধ ঘন্টার ভেতর সেখানে চলে গেলো রবিন। ভ্যাটিকান থেকেই শুরু করলো রোম দেখা। দুপুর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে চার্চের ভেতরের ছবি দেখলো, যার অনেকগুলো মাইকেলেঞ্জেলোর আঁকা। নাফিসা ওর ঝোলা ব্যাগে স্যাণ্ডউইচ, আপেল আর বড় এক বোতল মিনারেল ওয়াটার দিয়েছিলেন। ভ্যাটিকানের পাথর বাঁধানো সিড়ির ওপর বসে তাই খেলো। গাইড বুকে দেখে ওর আগ্রহ জন্মেছিলো পালাতিনো দেখার জন্য। আড়াই হাজার বছর আগে যেখানে রোমান সম্রাটরা থাকতেন। কলোসিয়ামের কাছেই। ঠিক করলো আজ পালাতিনো দেখবে, কাল দেখবে কলোসিয়াম।

একটা স্যাণ্ডউইচ শেষ করে আপেলে কামড় দিয়েছে— এমন সময় ওর বয়সী, সোনালী চুল আর নীল চোখের চমৎকার এক মেয়ে পরনে ব্লু জিনস-এর প্যান্ট আর জ্যাকেট, কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, 'কলোসিয়াম কিভাবে যাবো বলতে পারো?'

রবিন মৃদু হেসে বললো, 'আমি মাত্র কাল এসেছি রোমে। কিছুই চিনি না। তবে গাইডবুক দেখে বলতে পারি, বসো।'

মেয়েটা আগ্রহ নিয়ে রবিনের পাশে বসে বললো, 'আমার নাম পলা, ফ্রান্সের লিয়ঁতে থাকি। আমিও কাল এসেছি রোমে।'

রবিন ওর পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমি পালাতিনো যাবো। কলোসিয়ামের পরের স্টেশন। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো।'

পলা হেসে বললো, 'আমি খুব খুশি হবো। মনে মনে একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। ভালোই হলো তোমাকে পেয়ে।'

রবিন ব্যাগ থেকে একটা আপেল বের করে ওকে দিলো। পলা হেসে ধন্যবাদ জানালো। দেখেই মনে হয় ছাত্রী, হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। কাল রাতে নাফিসা ওকে বলছিলেন, এ সময় সারা ইউরোপ থেকে প্রচুর টুরিস্ট আসে, বেশির ভাগই কম বয়সী ছাত্র, নয়তো বুড়োবুড়ি। বুড়োদের অনেক টাকা পয়সা থাকলেও ছাত্ররা পার্কে কিম্বা স্টেশনে ঘুমোয়। অনেকে খাওয়ার পয়সা জোগাড়ের জন্য নানারকম কাজও করে।

পলাকে নিয়ে ও পাতাল রেলে চাপলো। ওর কাছে বাড়তি টিকেট ছিলো, পলাকে কাটতে দিলো না। টারমিনিতে রেল বদল করে কলোসিয়ামের রেলে চাপলো। দুপুরের দিকে কামরাগুলো একেবারে ফাঁকা থাকে। পলা বললো, 'তুমি কলোসিয়াম দেখেছো?'

রবিন বললো, 'আগামীকাল দেখবো।'

পলা একটু ইতস্তত করে বললো, 'আমি যদি আজ তোমার সঙ্গে পালাতিনো দেখে কাল কলোসিয়াম দেখি তোমার কি অসুবিধে হবে?'

'অসুবিধে কেন হবে! দুদিনের জন্য তোমার বন্ধু হতে ভালোই লাগবে।'

'বন্ধু যদি হবে, দুদিনের জন্য কেন? ফ্রান্সে বেড়াতে এসো। তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবো।'

'ধন্যবাদ, কখনো যদি যাওয়ার সুযোগ হয় তোমাকে জানাবো।'

ওরা ঠিকানা বিনিময় করলো। পলা ওর বাড়ির কথা বললো। রবিন বললো ঢাকার কথা। আধঘন্টা পর ওরা যখন পালাতিনোর প্রবেশ পথের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো— মনে হলো দু'জন অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু।

পালাতিনো দেখতে টিকেট কাটতে হয়। টিকেটের দাম শুনে পলা ঘাবড়ে গেলো। পাঁচ হাজার লিরা! শুকনো হেসে বললো, 'রবিন, আমি বরং কলোসিয়াম দেখে তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো! তুমি তো বললে তোমার এখানে তিন ঘন্টা লাগবে।'

রবিন মৃদু হেসে বললো, 'তুমি বলেছো আমার সঙ্গে কলোসিয়াম দেখবে। আজ তুমি আমার অতিথি। পালাতিনো আমি তোমাকে দেখাবো। গাইডের কাজও কিছুটা করতে পারবো।'

পলা রবিনের হাত চেপে ধরে কৃতজ্ঞ গলায় বললো, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে এত লিরা নেই যে, পাঁচ হাজার দিয়ে টিকেট কাটবো।'

'তুমি তো বলেছো ফ্রান্সে গেলে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে।'

'নিশ্চয় রবিন। লিয়ঁতে তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে আমার অতিথি হয়ে।'

টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলো ওরা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঁচু নিচু পাহাড়ের মত। মাঝে মাঝে ভাঙা প্রাচীর, উঁচু থাম, ফটক— এইসব। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে সামনে তাকিয়ে রবিন বললো, 'ওই ফাঁকা জায়গাটা দেখেছো পলা? ওখানে চ্যারিয়ট রেস হতো, বেনহুর ছবিতে যেমন দেখিয়েছে। রোমান অভিজাতরা এখানে বসে চ্যারিয়ট রেস দেখতেন।'

পলা বললো, 'তোমার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমি জুলিয়াস সিজারকে দেখছি।'

'আমি কেন সিজার হতে যাবো!' রবিন গম্ভীর হয়ে প্রতিবাদ করলো— 'সিজারের মাথাভরা টাক। আমি মোটেই সিজার হতে রাজী নই।'

রবিনের কথা বলার ধরণ দেখে পলা খিল খিল করে হাসলো। যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠলো। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন দুই খুনখুনে বুড়ি। বিরক্ত হয়ে তাকালেন ওদের দিকে। পলা চাপা গলায় বললো, 'ক্লিওপেট্রা বেঁচে থাকলে এদের মতই দেখতো হতো।'

রবিনও গলার স্বর নামিয়ে বললো, 'ভাগ্যিস আমি সিজার হতে চাই নি। যদি হতাম তাহলে তোমার কথা শোনার পর আমার হার্ট এ্যাটাক হয়ে যেতো। তার চেয়ে— 'বলতে গিয়ে থেমে গেলো সে। ওদের ডান দিকে বেশ কিছু দূরে বিমানে ওর সহযাত্রী ছিলেন— সেই বুড়ো প্রফেসর বরিস। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কি যেন দেখছেন। সঙ্গে আরেকজন বুড়ো।

রবিন বললো, 'চলো ওদিকে যাই। আমার পরিচিত এক এ্যানথ্রপলজির অধ্যাপকের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই।'

প্রফেসরের কাছে গিয়ে রবিন বললো, 'আপনি কেমন আছেন স্যার?'

প্রফেসর চমকে ওঠে রবিনের দিকে তাকালেন। যথেষ্ট নার্ভাস মনে হলো তাঁকে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'মাপ করবেন, আপনাকে আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে না।'

'কাল রোমে আসার সময় প্লেনে আপনি আমার সহযাত্রী ছিলেন।'

'আমি দুঃখিত। আপনাকে আমি চিনি না।' রূঢ় গলায় কথাটা বলে সঙ্গী বুড়োর হাত ধরে প্রফেসর নিচের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল বেশ তাড়া আছে ওর।

প্রফেসরের অদ্ভুত আচরণ ভীষণ রহস্যময় হনে হলো রবিনের।

নীলদের পেছনে গোয়েন্দা

বুলগেরিয়ান বন্ধু রিস্টোকে নীল কথা দিয়েছিলো নভেম্বরের চার তারিখে ওর সঙ্গে দেখা করবে। সোফিয়ায় কদিন ধরে রোজই মিটিং মিছিল হচ্ছে। বেশির ভাগ মিটিঙে যদিও দু তিনশ'র বেশি মানুষ হয় না, বিবিসি, ইটালিয়ান আর অস্ট্রিয়ান রেডিও তাই ফলাও করে বলছে। নাকি ঝিভকভের পতন হতে বেশি দেরি নেই। নীলের বাবার ধারণা এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার বান্দা নয় ঝিভকভ। কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ঝিভকভই সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করছেন। তারপর উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুঙ।

চার তারিখ ছিলো শনিবার। ঢাকায় দূতাবাসের ডাক পাঠাতে হয় এই দিনে। বাবার ফিরতে সাতটা আটটা বেজে যায়। ড্রাইভার তোবারক আলীও ব্যস্ত থাকে। নীল ঠিক করলো বাসেই চলে যাবে।

দুপুরে বাড়িতে খেতে এসেছিলেন বাবা। যাওয়ার সময় রীন চলে গেলো ওঁর সঙ্গে। কাউন্সিলার হাশমত সাহেবের মেয়ের সঙ্গে ও প্ল্যান করছে বিজয় দিবসে কী কী করা যেতে পারে। সোফিয়ায় অনেক বাঙালি ছাত্র আছে। সবাই মিলে এসব দিবসে চমৎকার অনুষ্ঠান করে। নীলের কাজ জিনিসপত্র জোগাড়যন্ত্র করা। ওরা কী করবে ঠিক করলে তারপর ওর কাজ শুরু। রীন বাবার সঙ্গে চলে যাওয়াতে ও উদ্বেগমুক্ত হলো। ভয় হচ্ছিলো রীন যদি শোনে ও ভিতুশা পাহাড়ে যাচ্ছে তাহলে নির্ঘাত ওর পিছু নেবে। বোনটাকে ও এত ভালোবাসে— কোনও কিছু আবদার করলে না বলতে পারে না।

বিকেল তিনটার দিকে নীল বাড়ি থেকে বেরুলো। মাকে বললো, রিস্টোদের ফ্লাটে যাচ্ছে, সন্ধ্যার পর ফিরবে। ওদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই ভিতুশা যাওয়ার বাস ষ্ট্যাণ্ড। পাহাড়ের গায়ে ঘোরানো রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে একেবারে চূড়ার কাছে চলে যায় বাস। নীলের অবশ্য বাসে করে ওপরে উঠতে ভালো লাগে না। ঝোলানো কেবল কার-এ মিনিট পনেরো সময় লাগে। তারে ঝোলানো বগিতে ঝুলে ওপর থেকে পাহাড়ের পাইন আর বার্চের বন দেখতে দেখতে পৌঁছে যায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে চেরনি ভ্রু পীক-এ। এখানে চমৎকার কিছু হোটেলও আছে।

গত দু'দিনে বাড়ি থেকে বেরোয় নি নীল। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বুলগেরিয়ার বিপ্লবের নেতা দিমিত্রভের জীবনী এনেছিলো চার খণ্ডের, সেগুলো পড়ে শেষ করেছে। বাইরে না বেরুলে রোজ সন্ধ্যার পর আলো জ্বেলে তোবারকের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলে। বয়সে অনেক বড় হলেও তোবারককে বন্ধুর মত মনে হয়। ওর বুলগেরিয়ান ভাষা শেখার প্রথম শিক্ষক ছিলো তোবারক।

ভিতুশা আসার পথে শহরে কোন গোলমাল চোখে পড়লো না। নীলের মনে হলো কাল রাতে বাবা ঠিকই বলেছিলেন, এখানে খুব শিগগির কিছু হবে না। বুলগেরিয়ার জীবন বাইরে থেকে দেখলে একটু ঢিলেঢালা মনে হলেও ঝিভকভের গোয়েন্দা পুলিশের নজর সবখানে। রিস্টো একদিন বলেছিলো, ঝিভকভের গোয়েন্দার সংখ্যা লাখ দশেক হবে। নীল অবাক হলে ও বুঝিয়ে দিয়েছিলো— 'এই যে বাড়িঘরের দেয়ালগুলো দেখছো না, প্রত্যেকটা দেয়ালের চোখ আর কান আছে। প্রত্যেকটা দেয়াল ঝিভকভের গুপ্তচর।'

রিস্টোর বাবা পাওয়ার প্ল্যান্টের একজন ইঞ্জিনিয়ার, নীলের সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছে, বিশেষ কোন কথা হয় নি। ভদ্রলোক কিছুটা চাপা স্বভাবের। রিস্টোর মা একমাথা সোনালী চুলের হাসিখুশি খাঁটি বুলগেরিয়ান মহিলা। সোফিয়া নিউজ এজেন্সিতে কাজ করেন। নীল ওদের বাসায় গেলেই সবজি আর মাংশের পুর দেয়া পিঠে বানিয়ে খাওয়ান। রিস্টো ওঁদের একমাত্র ছেলে, পড়াশোনায় খুবই ভালো। নীলের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় লাইব্রেরিতে বই নিতে গিয়ে। পরিচয়ের প্রথম দিনই রিস্টো ওকে ওদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিলো।

ঝোলানো কেবল কার-এ চেপে নীল যখন ভিতুশা পাহাড়ের চেরনি ভ্রু পিক-এ এলো, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটা। আরও আগেই আসতো, নিচের স্টেশনে কি যেন গণ্ডগোল হওয়ায় কেবল কার ছাড়তে পনেরো মিনিট দেরি হয়েছে।

রিস্টোর সঙ্গে এর আগে যে জায়গায় বসে গল্প করেছিলো, সেখানে যেতে আরও পাঁচ মিনিট লাগলো ওর। নীল আশা করেছিলো এসে দেখবে শোয়ানো ওক গাছের ডালে বসে রিস্টো পা দোলাচ্ছে। কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না। আশে পাশে তাকিয়ে দেখলো, রিস্টো তখনও আসে নি। পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ার জন্য ওর একটু খারাপ লাগছিলো। কাউকে কথা দিলে অক্ষরে অক্ষরে সেটা পালন করে নীল। রিস্টোকে না দেখে ও হাঁপ ছাড়লো।

কবে কোন ঝড়ে বহু বছরের পুরোনো বুড়ো ওক গাছটা মাটিতে কাত হয়ে পড়েছিলো। পুরো গাছটাই অক্ষত আছে, শুধু কাণ্ডটা নব্বই ডিগ্রির বদলে চল্লিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করেছে। মাটিতে শোয়ানো মোটা ডালটায় বসে সামনে তাকালো নীল। হেমন্তের সোনাগলা রোদে চকচক করছে গোটা সোফিয়া শহর। ভিতুশা পাহাড়ের গাঢ় সবুজ জমিনে, লাল, কমলা, খয়েরী, সোনালী আর হলুদ রঙের ছোপ লেগে আছে এখানে সেখানে। আর কদিন পর পাহাড়ের বেশির ভাগ গাছের পাতা ঝরে যাবে। শুধু চিরসবুজ পাইন গাছগুলো বর্শার ফলার মত মাথা উঁচিয়ে জানিয়ে দেবে প্রকৃতির জীবনস্পন্দন এখনো থেমে যায় নি।

ওক গাছের সব পাতা উজ্জ্বল কমলা রঙের হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় কমলা রঙের কার্পেটের ওপর একই রঙের কাপড়ের বিশাল স্তূপ। ডালে বসে সরু কাঠিতে পাতা গেঁথে একটা কমলা রঙের মুকুট বানালো নীল। রিস্টো এলে ওর মাথায় পরিয়ে দেবে।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো, রিস্টো এলো না। নীল মনে করার চেষ্টা করলো, আগে কখনো কথা দিয়ে রিস্টো দেরিতে এসেছে কি না। মনে করতে পারলো না। বাতাসের ছোট্ট একটা ঘূর্ণি ওক গাছের পাতা উড়িয়ে বয়ে গেলো। নীল ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো পাঁচটা বাজতে আর সাত মিনিট বাকি। ঠিক করলো এখানে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর ওদের ফ্ল্যাটে যাবে। কোন জরুরি কাজে হয়তো আটকে গেছে রিস্টো। সামনে তাকিয়ে দেখলো দূরে হালকা কুয়াশার নিচে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সোফিয়ার ঘরবাড়ি। পাহাড়ের ওপর রোদের তেজ মরে গেছে। হেমন্তে এখানে সাড়ে পাঁচটায় সন্ধ্যা নামে। ছ'টা না বাজতেই ঘুটঘুটে রাত। বাড়িতে বলে এসেছে, ফিরতে দেরি হলেও অসুবিধে হবে না।

পাঁচটা বাজার ঠিক দু'মিনিট আগে নীল দেখলো একজন মোটাসোটা বয়স্ক মহিলা এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর দিকে আসছেন। গাউনের ঝুল নেমেছে গোড়ালির কাছে, জুতো মুজো পরা, মাথায় ফুল তোলা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা। কাছে এসে চাপা খসখসে গলায় বললেন, 'বাছা, তুমি কি রিস্টোর বন্ধু?'

নীল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। আমি ওরই জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'রিস্টো আমাকে মালিশা খালা বলে। ওর মা আমার বান্ধবী। দাঁড়ালে কেন বসো।

আমিও একটু বসবো।' বলে তিনি ঘাসের ওপর বসলেন।

'মালিশা খালা, রিস্টো কি আসবে না?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলো নীল।

'না বাছা।' গলাটা আরেক ধাপ নামিয়ে বিষণ্ন গলায় তিনি বললেন, 'রিস্টো ভারি বিপদে পড়েছে। ওর বাপেরও খুব বিপদ।'

'কিসের বিপদ?'

'তুমি কি জানো না বাছা, ওর বাবা যে ঝিভকভকে সরাবার জন্য আন্দোলন করছে?'

'জানি, তাতে কী হয়েছে?'

'রিস্টোকেও এসব গোলমালে জড়িয়েছে ওর বাপ। গোয়েন্দা পুলিশের ভয়ে এখন বাপ ছেলে দুজনই ফেরার হয়েছে।'

'পুলিশ কি ওদের বাড়িতে এসেছিলো?'

'যখন তখন আসছে। আত্মীয়-স্বজন সবার বাড়িতে খোঁজ করছে। ওর মা, বেচারি গিয়র্গিয়েভা ভয়ে আধখানা হয়ে গেছে।'

'আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?'

'রিস্টোর মা পাঠিয়েছে। বললো, তোমার সঙ্গে নাকি রিস্টোর আজ এখানে দেখা করার কথা ছিলো। ও আসতে পারবে না। গিয়ার্গিয়েভা তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'আপনি না এলে আমি এখনই ওদের বাড়ি যাবো ভাবছিলাম।'

'না বাছা, বাড়ি যেও না। বাড়ির ওপর গোয়েন্দারা সারাক্ষণ নজর রাখছে। তুমি কাল পরশু সকালে শহর থেকে একটু দূরে এক জায়গায় ওর সঙ্গে দেখা করবে।'

'কোথায়?'

'তুমি কি বয়ানা চার্চের জাদুঘরে গিয়েছো কখনো?'

'বয়ানার নাম শুনেছি। জাদুঘরে যাই নি।'

'এই ফাঁকে তাহলে দেখে নিও। পরশু সকাল এগারোটায় ওই চার্চে তুমি দেখা করবে গিয়র্গিয়েভার সঙ্গে।'

'আপনি কি জানেন কিভাবে যেতে হয়?'

'কেন জানবো না বাছা! বয়ানা আমার বাপের বাড়ি। শোন, তুমি বুলেভার্ড মিহাইলভ থেকে একষট্টি নম্বর বাসে উঠবে। ওটা সোজা বয়ানা যায়।'

'কতক্ষণ লাগে যেতে?' নীলের গলায় উত্তেজনার আভাস।

'বেশি হলে চল্লিশ মিনিট লাগতে পারে। দাঁড়াও, তোমাকে লিখে দিচ্ছি, বাস থেকে নেমে কিভাবে যেতে হবে।' এই বলে মালিশা খালা হাতব্যাগ থেকে ছোট্ট নোটবই আর কলম বের করে রাস্তাটা এঁকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'এই যে ভিতুশা পর্বত দেখছো, বয়ানা গিয়েও এর দেখা পাবে! গির্জাটা ঠিক পাহাড়ের নিচে।'

সোফিয়ার আকাশে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরবাড়ি আর রাস্তার আলো সব জ্বলে উঠেছে। ভিতুশা পাহাড়ের চূড়ায় শেষ বিকেলের ম্লান আলো থাকলেও অল্প কিছুক্ষণের ভেতর এখানেও অন্ধকার নামবে। মালিশা খালা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি

ঝোলানো লিফটে করে নেমে যাও। আমি একটু পরে বাসে নামবো। কে জানে নচ্ছাড় গোয়েন্দারা আমার ওপর নজর রেখেছে কিনা।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কষ্ট করে এতটা পথ আমার জন্য।' বলে মালিশা খালার সঙ্গে হাত মেলালো নীল।

ওর কপালে চুমু খেলেন মালিশা খালা— 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাছা। রিস্টোর জন্য তুমিও কম করছো না। ভালো থেকো।' বলে আদর করে বিদায় জানালেন।

কেবল কারকে সোফিয়ার লোকেরা বলে ঝোলানো লিফট। নিচে নামার লিফট অপেক্ষা করছিলো। নীল উঠে বসার পর আরেকজন উঠলো। লিফটে চারজন বসতে পারে। চারজন হতেই লিফটের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। মোটা তারে ঝুলতে ঝুলতে নিচে নামতে লাগলো ওরা।

নীলের মুখোমুখি যে লোকটা বসেছিলো, যে ঠিক ওর পেছন পেছন উঠেছে, তার চোখে কালো গগলস ছিলো। সন্ধ্যাবেলা গগলস চোখে দেখে নীল ভাবলো হয় গ্রাম থেকে এসেছে লোকটা, গগলসটা আজই কিনেছে, কিম্বা চোখে অসুখ আছে। লোকটার মুখ জানালার দিকে ফেরানো ছিলো। গগলস চোখে দিয়ে আর যাই হোক সন্ধ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় না। মনে মনে হাসলো নীল। ও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলো না মালিশা খালা যে নচ্ছার গোয়েন্দাদের কথা বলেছিলেন এ লোকটা তাদেরই একজন, আড়চোখে গগলস-এর কালো কাচের ভেতর দিয়ে ওকেই দেখছিলো।

সোমবার সকালে নীল মাকে বললো, 'আমার এক টিচার থাকেন বয়ানায়। ওর কাছে যাবো অংকের কিছু সাজেশন আনতে। দুপুরে নাও ফিরতে পারি।' রীন যাতে সঙ্গে যেতে না চায় সে জন্যে মিথ্যে কথা বললো নীল।

রিস্টো বিপদে পড়েছে। এখন ওকে সাহায্য করা দরকার। নীল ভাবলো বয়ানা জাদুঘর যদি ভালো লাগে রীনকে নিয়ে অন্য একদিন দেখিয়ে আনবে। রীনের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের মহড়া, তাই নীলের সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরলো না।

ন'টার সময় বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো নীল। বাবাকে এম্ব্যাসিতে পৌঁছে তোবারক আলী ওকে বুলেভার্ড মিহাইলভের বাস ষ্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দিলো। তোবারক অবশ্য বলেছিলো, 'বয়ানার রাস্তা আমার চিনা আছে নীল বাই। চলেন, নামাই দিয়ে আসি।'

'না তোবারক ভাই।' বাধা দিয়েছে নীল— তুমি তো জানো এম্ব্যাসির গাড়ি নিয়ে বেশি ঘোরাফেরা বাবা পছন্দ করেন না।'

বাড়ির কাজের ভেতর বাবার গাড়িতে করে ওরা দুই ভাইবোন শুধু স্কুলে যাওয়া আসা করে। মা বাইরে গেলে ট্যাক্সি নিয়ে যান। কোথাও কোন পার্টিতে ওদের নেমন্তন্ন থাকলে তখন সবাই একসঙ্গে গাড়িতে যায়। নীলের কথা শুনে তোবারক ওকে দ্বিতীয়বার বয়ানা যাওয়ার কথা বলে নি।

সোফিয়ার বাসগুলো খুব সুন্দর, ইউরোপের অন্যসব শহরের মতই। জানালার পাশের আসনে বসে নীল বিপদে পড়া বন্ধুটির কথা ভাবছিলো। বাইরে হেমন্তের

চমৎকার সকাল। দূরে ঢেউ খেলানো কালচে নীল পাহাড়ে পাইন, অলিভ আর বার্চের বন। রাস্তার ধারে অনাদরে ঝোপে ঝাড়ে ফুটে আছে অজস্র গোলাপ। সারা বছর বুলগেরিয়ার যেখানে সেখানে রাশি রাশি গোলাপ ফুটে থাকে। অন্য কোন সময় হলে নীল আত্মহারা হয়ে নানা রঙের গোলাপের এই মনকাড়া শোভা দেখতো। পাহাড়ের গায়ে মেঘের আলোছায়ার খেলা দেখতো। রিস্টোর কথা ভাবতে গিয়ে ওর অন্য কিছু দেখার মন ছিলো না। দুটো সিট পেছনে যে ভিতুশা পাহাড়ের গগলস পরা গোয়েন্দাটা লেনিন টুপি মাথায় দিয়ে টুরিস্ট সেজে ওর ওপর নজর রাখছিলো তাও নীলের নজরে পড়ে নি।

মালিশা খালা বলেছিলেন, ওকে নামতে হবে গোল্ডেন ব্রিজ স্টপেজে। বয়ানা সোফিয়ার বাইরে ছোট একটা শহর। বাসের তিনটা স্টপেজ রয়েছে এখানে। গোল্ডেন ব্রিজকে বুলগেরিয়ানরা বলে য়্যাটনিটে মস্টভে। প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগলো আসতে। বাস থামতেই নেমে পড়লো নীল। পেছনে নামলো কালো চশমাধারী গোয়েন্দা এবং কয়জন সত্যিকারের টুরিস্ট। হাল্কা জ্যাকেট পরা তিনজন স্মার্ট আমেরিকান বুড়ি। ওদের সঙ্গে তরুণ বুলগেরিয়ান দোভাষী।

বুড়িদের কিচিমিচি শুনেও নীল ঘুরে তাকালো না। কালো চশমা ছাড়া সবাই সামনের স্ন্যাক বার-এ ঢুকে পড়লো। নীল এগিয়ে চললো স্টোন রিভার-এর দিকে। ভিতুশা পাহাড় থেকে ঝরণার মত নেমে এসেছে ছোট খরস্রোতা নদীটি। ছোট বড় নানা আকারের পাথরের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। বুলগেরিয়ানরা বলে পাথুরে নদী।

নদী পেরিয়ে পাঁচ মিনিট হেঁটে নীল এলো কপিটোটো নামের এক গ্রামে। রিস্টো বলেছিলো এই গ্রামেই নাকি ওর নানাবাড়ি। গ্রামের এক কালের বয়ানা গির্জা, এখন জাদুঘর। মালিসা খালা বলেছিলেন, আটশ বছরের পুরোনো চমৎকার সব ম্যুরাল নাকি রয়েছে এই জাদুঘরে। চশমাধারী গোয়েন্দা অলস পায়ে একজন টুরিস্টের মত নীলের পেছন পেছন আসছিলো। নীল গতকাল ওর চেহারা ভালো করে লক্ষ্য করে নি। তার ওপর ক্যাপ পরায় আজ ওকে অন্য রকম লাগছে।

মালিসা খালা যেমন বলেছিলেন, ভিতুশা পাহাড়ের ঠিক নিচেই জাদুঘর। আঙিনার পর পাইন, বার্চের জঙ্গলভরা পাহাড় শুরু হয়েছে। ছোট একটা ফলকে জাদুঘরের নাম লেখা। প্লভদিভে দেখা সাবেকি আমলের বাড়ির মতো দেখতে। দোতালা ইমারত, ওপরে টালির ছাদ। এক লেভা দিয়ে টিকেট কেটে ঢুকতে হয় জাদুঘরের ভেতরে। খালি কাউন্টারে বসে এক বুড়ো সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ছিলো। টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলো নীল। জানলো না ওর পেছনে কে আসছে। রিস্টোর মা ছাড়া আর কাউকে সে আশা করছিলো না। গোয়েন্দাটি এমন বেখেয়াল শিকার পেয়ে বেজায় খুশি। নিশ্চিন্ত মনে ও নীলকে অনুসরণ করছিলো।

জাদুঘরের ভেতরটা নীল যতটা জমকালো ভেবেছিলো তেমন কিছু নয়। দেয়াল জুড়ে সাধুসন্ত আর যীশুখৃষ্টের সহচরদের ছবি। যীশুর লাস্ট সাপার-এর দেয়ালচিত্রও আছে। টিকেট কাটার সময় ইংরেজি আর বুলগেরিয়ান ভাষায় দু'পাতার একটা বিবরণী

ধরিয়ে দিয়েছিলো কাউন্টারের নির্বিকার বুড়োটা।

নীল চোখ বুলিয়ে দেখলো, বেশির ভাগ ছবিই সাত আটশ বছর আগের আঁকা। এমন কিছু পুরোনো নয়। তবে মজা পেলো সাধুসন্ত আর যীশুর সঙ্গে নাম না-জানা শিল্পী বুলগেরিয়ার রাজারাণীর ছবিও এঁকেছে। নাকি ওরা মোটা চাঁদা দিয়েছিলেন গির্জার তহবিলে।

নিচের তলায় নীল আর গোয়েন্দা ছাড়া আরও চার পাঁচজন টুরিস্ট ছিলো, আর ছিলো সম্ভবত আর্ট স্কুলের কোন ছাত্রী। নীলের বয়সী মেয়েটা দেয়ালচিত্র দেখে দেখে নিখুঁত ভাবে খাতায় কপি করছে।

টুরিষ্টদের মত ছবি দেখতে দেখতে এক ফাঁকে দোতালা থেকে ঘুরে এলো নীল। রিস্টোর মা এখনো আসেন নি। নীলের সঙ্গে কাউকে কথা বলতে না দেখে গোয়েন্দাও হতাশ হলো। ওর বুঝতে অসুবিধে হলো না, শিকার যার জন্যে অপেক্ষা করছে সে এখনো আসে নি। সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছিলো ওর। ছোঁড়া এমনভাবে ম্যুরাল দেখছে মনে হয় সত্যি সত্যি বুঝি এসব দেখার জন্যেই এতদূর এসেছে।

সিগারেট খাওয়ার জন্য বাইরে গেলো গোয়েন্দা। ঠিক তখনই দর্শনার্থীদের ভেতর থেকে কুচকুচে কালো চুলোর মাথায় টুপি পরা দারুণ সাজগোজ করা এক মহিলা—মনে হয় গ্রীক অথবা তুর্কী, নীলের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন। দেয়ালের ছবি দেখতে দেখতে ঘাড় না ফিরিয়ে বললেন, 'পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে। কালো চশমা, মাথায় টুপি। তুমি কপিটোটো হোটেলের রান্নাঘরে বাবুর্চি রুসেভের সঙ্গে দেখা করবে। আমি সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। পেছনের আঙিনায় টয়লেটের পাশ দিয়ে যে রাস্তা আছে ওটা দিয়ে ঘুরে হোটেলে এসো।'

মহিলা চলে গেলেন। নীল রীতিমত হতবাক। দারুণ মেকাপ নিয়েছেন রিস্টোর মা। গলা না শুনলে চিনতেই পারতো না। অবশ্য এরকম কালো চুলের কেউ রিস্টোর মা হবেন এমনটা সে আশাও করে নি।

তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল টয়লেটের দিকে গেলো। আড়চোখে দেখলো গির্জার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে গোয়েন্দা সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের বোকামির জন্য রাগ হলো নীলের। একবারও ওর মনে হয় নি পেছনে গোয়েন্দা লাগতে পারে।

গির্জার পেছনে আঙিনার ওপাশে একসারি ঘর। সম্ভবত মালি আর পাহারাদারেরা থাকে। ওরই একটা ঘরে টয়লেট। তার পাশ দিয়ে ছোট কাঠের পাল্লাওয়ালা বাইরে যাওয়ার দরজা।

দেয়ালচিত্রের জাদুঘর বলে পাহারার কোন কড়াকড়ি নেই। কেউ তো দেয়াল তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। সামনে একজন ঢিলেঢালা পাহারাওয়ালা চোখে পড়েছে, পেছনে তাও নেই। নীল নির্বিঘ্নে জাদুঘর থেকে বেরিয়ে সরু পাথরের রাস্তা দিয়ে গ্রামের ভেতর হাঁটতে লাগলো।

এখানে আসার পথেই কপিটোটো হোটেল চোখে পড়েছে নীলের। বেশ বড় হোটেল। জায়গাটা টুরিস্ট স্পট। এখান থেকে কেবল কার-এ ভিতুশা পাহাড়ের ভেতর

ক্লাঝেভো যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ের ওপর উঠলে বহু দূরে ছবির মত সাজানো সোফিয়া শহর দেখা যায়।

গ্রামের ভেতর পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তাটা ঘুরে বড় রাস্তায় উঠেছে। নীল বড় রাস্তায় উঠে দ্রুত হাঁটলো। পেছনে তাকিয়ে দেখলো কালো চশমার নাম নিশানা নেই। মিনিট দশেকের ভেতর ও হোটেলে পৌঁছে গেলো।

রেস্টুরেন্টের একজন মাঝবয়সী ওয়েটারকে নীল বললো, 'রুসেভের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ও রান্নাঘরে আছে।'

ওয়েটার মাথা নেড়ে বললো, 'ও তো রান্নাঘরেই থাকবে। এসো আমার সঙ্গে।'

কিচেনের দরজা ফাঁক করে গলা ঢুকিয়ে ওয়েটার ডাকলো 'রুসেভ, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' কিচেন থেকে একটা বাজখাই গলা ভেসে এলো।

ওয়েটার দরজা খুলে ইশারায় নীলকে ভেতরে যেতে বললো। নীল ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওয়েটার চলে গেলো। সাদা এ্যাপ্রন আর টুপি পরা বাবুর্চি রুসেভ ওকে দেখে বললো, 'তুমি বুঝি আমাদের রিস্টোর বন্ধু?'

দু' পাশে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো নীল।

'গিয়র্গিয়েভা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এসো আমার সঙ্গে।' এই বলে রুসেভ ওকে পেছনের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেলো।

ঘরের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে পুরু ওক কাঠের টেবিল। নীল দেখেই বুঝলো ওটার ওপর রেখে তরকারি কাটা হয়। সারা টেবিলে ছুরির দাগ, এক কোণে বাঁধাকপির কয়েকটা পাতা আর আলুর খোসা পড়ে আছে। রিস্টোর মা টেবিলের পাশে একটা পেটানো লোহার চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর সামনে একই ধরনের আরেকটা চেয়ার। নীলকে দেখে বললেন, 'এসো বাছা, এখানটায় বসো।'

রুসেভ বললো, 'লিলিয়া গিয়র্গিয়েভা, আমি আপনাদের জন্য কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শুকনো হেসে রিস্টোর মা বললেন, 'ধন্যবাদ রুসেভ। আমাদের কালো কফি দিও।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলো রুসেভ। ঠাণ্ডা লোহার চেয়ারে বসে নীল বললো 'আমি আপনাকে চিনতে পারি নি আন্টি।'

ম্লান হাসলেন গিয়র্গিয়েভা— 'আমার বান্ধবী মালিশাকে তুমি কাল দেখেছো। বললো, তোমার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে। ও থিয়েটারে কাজ করে। ভালো মেকাপ জানে। ওই সব করেছে। এখন বলো, পাজিটাকে ঠিক মত খসাতে পেরেছিলে?'

মাথা নাড়লো নীল— 'আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। রিস্টোর কথা বলুন। ওর কোনও বিপদ হয় নি তো?'

'এখনো গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নি। তবে বিপদের তলোয়ারের নিচে মাথা পেতে দিয়ে বসে আছে ওর বাপ আর ও দুজনই।'

'খুলে বলুন না আন্টি কি হয়েছে?'

'শহরে প্রথম যেদিন মিটিং মিছিল হলো, তার দু'দিন পরই গোয়েন্দা পুলিশ এলো রিস্টোর বাপকে ধরতে। ও তখন বাড়িতে ছিলো না। কোথায় থাকতে পারে জানতাম।

পুলিশ চলে যেতেই রিস্টোকে পাঠালাম খবর দিতে। বিকেলে আবার এলো ওরা। রিস্টোকেও খুঁজলো। বললাম, নানার বাড়ি বেড়াতে গেছে। সন্ধ্যায় নিচের ফ্লাটের একজনকে দিয়ে ওদের খবর পাঠালাম কারো ঘরে ফেরার দরকার নেই। পরদিন সন্ধ্যায় আবার এলো। বললো, রিস্টো নানাবাড়ি যায় নি। শুনে আমি কান্নাকাটি করলাম। বললাম, তাহলে তোমাদের কেউ ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ওরা কিছু না বলে চলে গেলো। তারপর সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই— যখন তখন আসে, ধমকায়। বলে, ওদের খবর না দিলে আমার বুড়ো বাপ মাকে ধরে জেলে পুরে দেবে।'

রিস্টোর বিপদের কথা ভেবে নীল উদ্বিগ্ন হলো। ও জানে ধরা পড়া মানে সোজা ফায়ারিং স্কোয়াড। বললো, 'এভাবে কতদিন ওরা পালিয়ে থাকবে আন্টি?'

ভারি গলায় গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'যতদিন না ঝিভকভের পতন হচ্ছে।'

'আপনি কি মনে করেন খুব শিগগির ঝিভকভের পতন হবে?'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না বাছা। দুদিন খুব মিটিং মিছিল হলো। তারপর থিতিয়ে গেলো। ঘরে ঘরে তল্লাসি চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের দল কম বয়সী যাকেই সন্দেহ করছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বলছেও না কোথায় নিচ্ছে। ওদের যে কি হবে!' রুমালে চোখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠলেন গিয়র্গিয়েভা।

নীল আস্তে আস্তে বললো, 'রিস্টো আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চেয়েছিলো আপনি জানেন?'

চোখ মুছে মাথা নাড়লেন গিয়র্গিয়েভা— 'পরশু ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে। বিদেশে কিছু কাগজ পাঠাতে চায় ওরা। তোমার বাবা একজন রাষ্ট্রদূত। তিনি যদি কিছু ব্যাপারে সাহায্য করেন তাহলে রিস্টোরা খুব খুশি হবে।'

'কি ধরনের সাহায্য?' জানতে চাইলো নীল।

'ধরো ফ্যাক্স মেশিনের সাহায্য। কিম্বা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে দু একটা চিঠি পাঠানো— '

'এগুলো তো বে'আইনি কাজ। বাবা মনে হয় না রাজী হবেন।'

শুকনো গলায় গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'তুমি ওর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখো। দরকার হলে কমিটির কেউ ওঁর সঙ্গে কথা বলবে। এটুকু আশা করি তুমি করবে।'

'দেখা করার ব্যবস্থা আমি করিয়ে দিতে পারবো।'

'তাহলেই হবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বাছা।'

দরজা খুলে কফির কাপ হাতে ঘরে ঢুকলো রুসেভ। টেবিলের ওপর কাপ দুটো রেখে বললো, 'একটু আগে কালো চশমাপরা গোয়েন্দাটা এসেছিলো। আমাদের রেস্টুরেন্টে। পেত্রভকে বলে রেখেছিলাম। ও গোয়েন্দাটাকে বলেছে বিদেশী ছেলেটা এসেছিলো। তারপর এক বুড়ো তুর্কীও এসেছিলো। দুজনে বসে কফি খেয়েছে, কথাবার্তা বলেছে, তারপর একসঙ্গে লিফটে চেপে ক্লাঝেভো চলে গেছে।'

মৃদু হেসে গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ রুসেভ। ভালো করেছো গোয়েন্দাকে তাড়িয়ে দিয়ে। নইলে নীলকে অযথা জ্বালাতন করতো।'

কফি শেষ করে নীল বললো, 'এবার যাই তাহলে। আপনাকে এ্যাপয়েন্টমেন্টের

কথা জানাবো কিভাবে?'

'আমি তোমাকে ফোন করবো। নাম বলবো ইরিনা। মনে রেখো। তুমি শুধু দিন আর সময় বলে দিও। যদি তোমার বাবা দেখা করতে না চান তাহলে বলবে রং নম্বর।'

নীল উঠে দাঁড়ালো— 'রিস্টোকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। ওকে বলবেন এম্ব্যাসিকে না জড়িয়ে যদি আমাকে দিয়ে কোন কাজ হয় বলতে। ওর জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশি হবো।'

নীলের মুখের দিকে তাকালেন গিয়র্গিয়েভা। এই মূহূর্তে ওকে ঠিক রিস্টোর মত মনে হচ্ছে। ওর চেহারায় সেরকম তেজ আর সাহস। পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে, তারপরও এতটুকু ঘাবড়ে যায় নি। উঠে দাঁড়িয়ে নীলের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'সাবধানে যেও। চারদিকে নজর রেখো। কাউকে সন্দেহজনক মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে খসিয়ে ফেলো। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি পারবে আমার লক্ষ্মী বাছাটি।'

কপিটোটো হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামার আগে চারপাশে তাকিয়ে কালো চশমাপরা লোকটাকে কোথাও দেখতে পেলো না নীল। ভাবলো, পাজিটা এতক্ষণে নিশ্চয় ক্লাজেভোতে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলো ওকে সোফিয়ার বাস ধরার জন্য। পরে আরেকজন মহিলা এসে দাঁড়ালো ওর পেছনে। দেখে মনে হয় প্রাইমারি স্কুলের খিটখিটে মাস্টারনী। বাস আসতেই ও উঠে পড়লো, পেছনে সেই মহিলাও। নীল খুঁজছিলো কালো চশমাপরা গোয়েন্দাকে। না, দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ও ঘুণাক্ষরেও জানলো না, যাকে মাস্টারনী ভেবে বসে আছে সেই মহিলাও ঝিভকভের গুপ্ত বাহিনীর একজন গোয়েন্দা।

রোমে রবিনের অভিজ্ঞতা

পলার সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় যখন রবিন ঘরে ফিরলো, নাফিসা তখন চায়ের পট সাজিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। রবিনকে তিনি বার বার বলে দিয়েছিলেন যেখানেই থাকুক সন্ধ্যার পর যেন ঘরে ফিরে আসে। কতক্ষণই বা দেখেছেন ছেলেটাকে, এরই ভেতর ভীষণ মায়া পড়ে গেছে ওর ওপর। অবিকল ওর বাবার মত দেখতে হয়েছে। সেই ফর্শা রঙ, ধারালো চিবুক, মায়াবি চোখ, এলোমেলো এক গোছা চুল

কপালে এসে পড়া— এমন কি চশমার ফ্রেমও ওর বাবার যেমনটি ছিলো, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন।

নাফিসা ভাবলেন, রবিনের মতো ওঁর যদি একটা ছেলে থাকতো! বন্ধুরা এখনো বলে, নাফিসা বিয়ে করছো না কেন। তিনি জানেন, বিয়ে করলে তিনি একজনকেই করতেন। সেটা যখন হয় নি তখন বিয়ে করার কথা তিনি ভুলে গেছেন।

সূর্য ডুবে গেছে, তখনও অন্ধকার নামে নি। আকাশে গাঢ় কমলা রঙের মেঘ জমে আছে। তখনই তিনি রবিনকে দেখলেন দূরে, একা হেঁটে আসছে হালকা পায়ে। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোটের ফাঁকে।

কাছে এসে মেইন গেট-এর পাশে নাফিসার নাম লেখা কলিং বেল টিপলো রবিন। তারপর কলিং বেলের বোতামের পাশে ছোট্ট দেয়াল মাইক্রোফোনে নিজের নাম বললো। খুলে গেলো ভারি লোহার দরজা। লিফটে উঠে পনেরো নম্বরের বোতাম টিপলো। ইলেকট্রনিক লিফটে হুশ করে উঠে এলো পনেরো তলায়। দেখলো দরজা খুলে নাফিসা দাঁড়িয়ে আছেন। ধবধবে সাদা সুতীর শাড়ি পরেছেন, ব্লাউজও সাদা, পায়ে সাদা স্লিপার। মৃদু হেসে বললেন, 'এসো রবিন, খুব বেড়িয়েছো রোদের ভেতর!'

রবিন হেসে বললো, 'এই চমৎকার রোদে বেড়াতে দারুণ ভালো লেগেছে।'

রবিন ভেতরে ঢোকার পর নাফিসা দরজা বন্ধ করলেন— 'মুখ হাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করছি।'

তিন মিনিটের ভেতর ফ্রেশ হয়ে এলো রবিন। সিঙাড়ার মত মাংশ আর সবজির পুর দেয়া এক ধরনের খাবার বানিয়েছেন বাড়ির যে কাজ করেন ইটালিয়ান মহিলাটি। নাফিসা বললেন, 'ইটালীর সাউথে এ ধরনের পাস্তা বানায়। এ মহিলাটি সিসিলিয়ান।'

একটু টক আর ঝাল ঝাল— খেতে দারুণ লাগলো। খিদেও পেয়েছিলো রবিনের। পর পর কয়েকটা পাস্তা খেয়ে ফেললো। নাফিসা স্নেহভরা চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। খাওয়া থামাতেই বললেন, 'আরও নাও না রবিন। সারাদিন তো কাটিয়েছো দু তিন খানা স্যান্ডউইচ দিয়ে।'

আরেকটা পাস্তা তুলে নিয়ে রবিন বললো, 'জানেন আন্টি, রোমে আসতে না আসতেই চমৎকার এক বন্ধু পেয়ে গেছি।' পলার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হলো সবটুকু সে নাফিসাকে বললো। 'কালও আমরা দুজন সারাদিন ঘুরবো বলে ঠিক করেছি।'

'মেয়েটা কি খুব সুন্দর দেখতে?'

'দারুণ! মনে হয় সিসটিন চ্যাপেলের ছবি থেকে উঠে এসেছে। সোনালী চুল, গভীর নীল চোখ— ' বলতে গিয়ে লাল হলো রবিন।

ওর উচ্ছ্বাস দেখে নাফিসা মৃদু হাসলেন— 'তুমি কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করছো রবিন।' এই বলে রহস্যভরা চোখে ওর দিকে তাকালেন।

রবিন একটু অপ্রস্তুত হলো— 'কিভাবে আন্টি?'

'আমার সঙ্গে ঘুরছো না। তোমার বাবা বলবেন আমি তোমাকে ঠিকমত ঘুরিয়ে দেখাই নি।'

'বাবা কখনো এমন কথা বলবেন না। কচি খোকা নাকি হাত ধরে ঘুরিয়ে দেখাতে

হবে! আমি যা দেখবো সে সব বহুবার আপনার দেখা।'

'ঠিক আছে, কাল না হয় চমৎকার বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরলে। এখন আমার সঙ্গে ঘুরতে তোমার কেমন লাগবে?'

'কোথায়?'

'সমুদ্রের তীরে। পঁচিশ মিনিটের ড্রাইভ।'

'দারুণ হবে আন্টি।'

'তাহলে একটা গরম জ্যাকেট পরে নাও। রাতের খাবার আমরা বাইরে খাবো।'

'ইটালিয়ান নিশ্চয়?'

'অবশ্যই ইটালিয়ান।'

রবিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'ইউ আর রিয়েলি গ্রেট।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর কাপড় পাল্টে তৈরি হলো রবিন। নাফিসা যে শাড়ি পরেছিলেন তার ওপর সাদা মোটা একটা উলের কার্ডিগান পরলেন আর স্লিপার পাল্টে জুতো পায়ে দিলেন। লিফটে নামতে নামতে রবিন বলেই ফেললো, 'আন্টি, আজ আপনাকে দেবীর মত লাগছে।'

'কাল বললে পরি, আজ বলছো দেবী, আগামীকাল কি বলবে অপ্সরী?' হালকা গলায় নাফিসা বললেন, 'তোমাকে যে রূপকথার রাজপুত্রের মত মনে হচ্ছে এ কথা নিশ্চয় আমার মত বুড়ির মুখে শুনতে ভালো লাগবে না?'

'কক্ষণো আপনি বুড়ি নন আন্টি। বাবার বন্ধু না হলে আমিই আপনার বন্ধু হতে চাইতাম।'

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে হাসি চেপে নাফিসা বললেন, 'তুমি একটা পাজি ছেলে রবিন।'

রবিন বললো, 'বাবা আমার বন্ধুর মত।'

সহজ গলায় নাফিসা বললেন, 'আমি জানি রবিন।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রবিন বললো, 'বাবা কি আপনাকে চিঠি লেখেন আন্টি?'

'না।' ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো নাফিসার ঠোঁটে। গাড়ি তখন শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়েছে। চলছে ষাট মাইল স্পীডে। কথাটা রবিনকে বলা ঠিক হবে কিনা একবার ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তোমার বাবা আমার জন্মদিনটা ছাড়া আর কিছুই মনে রাখেন নি রবিন। মাঝে মাঝে আমি ফোনে কথা বলি।'

'মনে রাখেন নি এ কথাটা ঠিক নয় আন্টি। আমি বহুদিন থেকে জানি আপনি বাবার একমাত্র বন্ধু।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নাফিসা আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার কথা বাবা তোমাকে কী বলেছেন?'

'বলেছেন বাবার কিছু হলে সবার আগে আপনাকে আর মেজোচাচাকে যেন জানাই। দাদী মারা যাওয়ার সময় জোর করে বাবাকে বিয়ে দিয়েছেন আমার মা'র সঙ্গে। নানির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দাদী।'

নাফিসা বাধা দিলেন— 'ওসব কথা আমি জানি রবিন। তোমার মা চমৎকার মানুষ ছিলেন।'

রবিন আপন মনে বললো, 'আমার কাছে মা শুধু দেয়ালে ঝোলানো দুটো ছবি ছাড়া আর কিছু নয়।' কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো সে। তারপর বললো, 'বাবা আমাকে এইচ এসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর বলেছিলেন, বাইরে গিয়ে কোথাও পড়তে চাই কিনা। আপনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'সেটা আমি এখনও পারি রবিন।' আস্তে আস্তে নাফিসা বললেন, 'তোমাকে বাইরে পাঠাবার কথা আমিই বলেছিলাম। দেশে তখন খুব গোলমাল ছিলো। এরশাদের পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালিয়েছে— এখানে বসেই সেসব খবর পেয়েছি।'

রবিন একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমরা যদি সবাই বাইরে চলে যাই এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে কে?'

'তোমার বাবাকেও তখন তুমি এ কথা বলেছিলে রবিন। ছাত্র জীবনে তোমার বাবাও রাজনীতি করতেন।'

'বাবার সঙ্গে এখনও পার্টির যোগাযোগ আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা থেকে আপনি অনেক টাকা তুলে পাঠিয়েছিলেন।'

রবিনের বাবার কথা ভাবতে গিয়ে নাফিসার বুকটা ভরে গেলো। ভেবেছিলেন নিজের ছেলেকে পুরোনো বান্ধবীর কথা নাও বলতে পারেন। অনেক কথা মনে পড়লো তার। রবিন একবার বললো, 'পলার সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবো।' নাফিসা শুনতে পেলেন না।

সমুদ্রের তীর ধরে চলে গেছে পাকা রাস্তা। ডান দিকে দোকানপাট আর ঘরবাড়ি, বাঁদিকে চকচকে কালো সমুদ্র। আলো ঝলমলে রেস্টুরেন্টের পাশে নাফিসা গাড়ি পার্ক করে নামলেন। এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস রবিনের মুখে ঝাপটা মারলো। বুক ভরে সমুদ্রের তাজা বাতাস টানলো। একটা বড় প্ল্যাটফর্মের মত করা হয়েছে সমুদ্রের ভেতরের দিকে। চারপাশে আলোর বন্যা। নানা বয়সী মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। কোন কোন পরিবার রাতের খাবার সেরে নিচ্ছে সমুদ্রের বুকে বসে। রবিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'চমৎকার জায়গা।'

নাফিসা বললেন, 'শীত লাগছে না তোমার?'

'একটু লাগছে।' কথাটা স্বীকার করলো রবিন। তারপরও বললো, 'এখানে না এলে রোমের চমৎকার সুন্দর একটা জায়গা মিস করতাম।'

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ ঘুরে রবিনকে নিয়ে নিরিবিলি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলেন নাফিসা। কয়েক রকমের পাস্তা, কাবাব আর সালাদের অর্ডার দিলেন। রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কখনো ওয়াইন খেয়েছো?'

রবিন লাজুক হেসে বললো, 'বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কয়েকবার বিয়ার খেয়েছি।'

'এখানে ষোল বছর হলেই হার্ড ডিংক এ্যালাউ করে। একটু রেড ওয়াইন নাও। এখানকার ওয়াইন পৃথিবীর সেরা।'

শুনে উত্তেজিত হলো রবিন। নাফিসাকে খুবই আপনজন মনে হলো। ওয়েটার এসে

প্রথমে চমৎকার ক্রিস্টালের ওয়াইন গ্লাসে টলটলে লাল মদ দিয়ে গেলো। নাফিসা রহস্য করে বললেন, 'তোমার বন্ধু জানে তুমি যে মদ খাও?'

'কোন বন্ধু?' জানতে চাইলো রবিন।

'ওই যে বললে, বাবা তোমার একজন ভালো বন্ধু।'

'তাই বলুন।' হেসে ফেললো রবিন— 'হ্যাঁ, বাবা জানেন। আপনি যে রেড ওয়াইন খাওয়াচ্ছেন এটাও জানবেন।' একটু থেমে রবিন বললো, 'আমি একটা কথা বলবো আপনাকে?'

'বলে ফেলো।'

'বাবা যদি বন্ধু হন, তাহলে বাবার একমাত্র বন্ধু তো আমার বন্ধু হতে পারেন।'

নাফিসা গম্ভীর হওয়ার ভান করলেন— 'হ্যাঁ পারি। যদি তোমার বাবার আপত্তি না থাকে।'

রবিন গলা খুলে হাসলো— 'বাবা কক্ষণো অমন নয় আন্টি। আপনি বাবাকে খুব ভালো করেই জানেন।'

'তাহলে এসো।' বলে নাফিসা মদের গ্লাস তুললেন— 'টোস্ট করা যাক। আমাদের বন্ধুত্বের উদ্দেশে।' নিজের গ্লাস তুলে রবিন নাফিসার গ্লাসের সঙ্গে ছোঁয়ালো। হেসে বললো, 'আমাদের বন্ধুত্বের উদ্দেশে।' তারপর গ্লাসে চুমুক দিলো। সামান্য টক, মিষ্টি আর ঝাঁঝালো স্বাদ— দারুণ লাগলো ওর কাছে।

ইটালিয়ান পাস্তাও খেতে খুব মজা লাগলো। কয়েক রকমের পাস্তা দিয়েছে। নাফিসা প্রত্যেকটার আলাদা নাম বলে ওর প্লেটে তুলে দিলেন। অনেকটা নুডল্‌সের মতো, ভেতরটা ফাঁপা, কোনও ডিশে লাল টমাটো সস, কোনওটায় নাম না জানা সাদা সবুজ সস, পনির আর মাংসের কুচি মাখানো। নাফিসা বললেন, 'ইটালিয়ানদের ভাত হচ্ছে এই পাস্তা। দেড়শ রকমের পাস্তা পাওয়া যায় এখানে। দেখতেও একেকটা একেক রকম।'

'সত্যি অপূর্ব লাগছে আন্টি। এতটা মজার হবে আমি আশা করিনি।'

'ইটালিয়ানরা খাবার আর পোষাকের ব্যাপারে খুবই সৌখিন। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় বিলাসীও বলতে পারো।'

রেস্টুরেন্টের দোতালার বারান্দায় বসে খাচ্ছিলো ওরা। মাথার ওপরে ছাদ থাকায় শীত কম লাগছিলো। সামনে সমুদ্রের দিকটা খোলা, মাঝে মাঝে তাজা লোনা বাতাস বয়ে যাচ্ছিলো। মদের গ্লাস যতবার খালি হলো ওয়েটার এসে আবার ভরে দিয়ে গেলো। খাবার দেয়ার সময় টমাটো জুসও দিয়েছিলো লম্বা গ্লাসে।

নিজেকে পালকের মতো হালকা মনে হচ্ছিলো রবিনের। টেবিলে সাদা কাচের ঢাকা দেয়া আলোর নরম আভায় নাফিসাকে মনে হচ্ছিলো মোমে গড়া স্বর্গের কোন দেবী। নাফিসা রবিনের ভেতর তাঁর ছাত্রীজীবনের সবচেয়ে কাছের বন্ধুটিকে খুঁজছিলেন।

খাবার শেষ হওয়ার পর ওয়েটার প্লেট ডিশ সব নিয়ে গেলো। দু'জনের সামনে লাল মদের গ্লাস। বাবার কথা মনে হলো রবিনের। বাবা ভাবতেও পারবেন না ওঁর বন্ধুর

সঙ্গে রোমের এই চমৎকার রাতে সে বন্ধুর মতো কথা বলছে। সামনে তাকিয়ে দেখলো নাফিসা ওকেই দেখছেন। ওঁর দু'চোখ গভীর মমতায় ভরা। রবিনকে তাকাতে দেখে নাফিসা মৃদু হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন— 'কি ভাবছো?'

'বাবার কথা।'

'বাবার কথা কি ভাবলে?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে অন্য এক জগৎ থেকে রবিন আস্তে আস্তে বললো, 'আচ্ছা আন্টি, আমি, আপনি, বাবা— আমরা তিনজন কি একসঙ্গে থাকতে পারি না?'

'এ কথা কেন বলছো রবিন?'

'বাবার কথা ভাবলে কষ্ট হয় আন্টি। আমি তো আমার পড়াশোনা, বন্ধু বান্ধব আর সংগঠনের কাজে বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকি। বাবা সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আমি যে এখন নেই— বাবার খুব খারাপ সময় কাটছে।'

'ঠিক আছে রবিন।' নাফিসা আস্তে আস্তে বললেন, 'আজ রাতে তোমার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলবো।'

'আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দেন নি।'

'কী বলবো রবিন!' একটু থেমে আপন মনে নাফিসা বললেন, 'এভাবে আমি কখনো ভাবি নি।'

'এবার ভাবুন আন্টি। আমি বলছি এতে আমাদের সবার ভালো হবে।'

'জানি না রবিন।' ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাফিসা বললেন, 'চলো, ওঠা যাক। রাত অনেক হয়েছে।'

সময় কিভাবে কেটেছে কিছুই টের পায় নি রবিন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে এসেছে। রোমে তখন মধ্যরাত। অল্প দূরে বিশাল কালো কার্পেটের মত বিছানো রয়েছে নিঃসঙ্গ ভূমধ্যসাগর।

বাবার সঙ্গে শেষ রাতে নাফিসা আন্টির কি কথা হয়েছে রবিন জানতে পারে নি। ও তখন গভীর ঘুমে ডুবেছিলো। স্বপ্ন দেখছিলো, ওরা তিনজন জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছে। একপাশে বাবা, আরেক পাশে নাফিসা আন্টি, মাঝখানে রবিন দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের ডেকে রেলিং-এ ভর দিয়ে। সাদা সাদা সিগাল এলোমেলো উড়ছে, ঢেউয়ের সাথে লুটোপুটি করছে। হু হু বাতাস ওদের চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। বাবা দারুণ সব হাসির কথা বলছেন, সবাই গলা খুলে হাসছে। হাসতে হাসতে এক সময় নরম সিগাল হয়ে গেলেন নাফিসা আন্টি। ডানা মেলে উড়ে গেলেন গভীর সাগরে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রবিন নাশতার টেবিলে নাফিসাকে দেখলো। হালকা কুয়াশার মত বিষণ্নতার ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে। রবিন উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে স্বপ্নের কথা বললো। নাফিসা ম্লান হাসলেন। কোন কথা বললেন না। রাতের ফ্লাইটে চলে যাবে রবিন। কতক্ষণই বা দেখেছেন মা হারা ছেলেটাকে! কাল রাতেই নাফিসা বুঝতে পেরেছেন রবিন ওঁর ভেতর নিজের মাকে খুঁজছে। রবিনের বাবাকে টেলিফোনে এসব কথা তিনি বলেন নি। হয়তো কোন দিনই বলবেন না।

নাশতা সেরে রবিন নাফিসার সঙ্গেই বেরুলো। পলাকে ও ঠিক নটায় রোমের রেল

স্টেশন টারমিনিতে আসতে বলেছে। ওর ব্যাগে নাফিসা বেশি করে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিয়েছেন। আপেলও দিয়েছেন কয়েকটা। বোঝা ভারি হবে বলে পানির বোতল নেয় নি রবিন। কালই দেখেছে আড়াই হাজার লিরায় বড় এক বোতল মিনারেল ওয়াটার কিনতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ টাকায় অনেক হলেও নাফিসার দেয়া পঞ্চাশ হাজার লিরার প্রায় কিছুই খরচ হয় নি।

নাফিসা ওকে টারমিনিতে নামিয়ে দিয়ে অফিসে চলে গেলেন। বললেন সন্ধ্যের আগে ফিরতে। ছটায় ওকে এয়ারপোর্ট পৌছতে হবে।

স্টেশনে ঢোকার পথে দাঁড়িয়েছিলো পলা। রবিনকে ও গাড়ি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এসে মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানালে— 'হাই রবিন।'

রবিনও হেসে বললো, 'হাই পলা। তোমাকে কি বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি?'

রবিনের সঙ্গে হাত মেলালো পলা— 'এখন ঠিক নটা বাজে। আমি পাঁচ মিনিট আগে এসেছি।' এই বলে একটু রহস্য হাসলো— 'দামী গাড়িতে অসাধারণ সুন্দরী এই মহিলার সঙ্গে কোত্থেকে এলে রবিন?'

লাজুক হেসে রবিন বললো, 'তিনি আমার আন্টি। আমি ওঁর বাড়িতেই উঠেছি।'

নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে পলা বললো, 'হে ঈশ্বর, রোমে যদি রবিনের আন্টির মত আমারও একজন আন্টি থাকতো!'

'ঠিক আছে পলা। আন্টিকে তোমার কথা কালই বলেছি। তুমি তো কদিন রোমে থাকছো। যদিও চাও পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

'আমি খুবই আনন্দিত হবো রবিন!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো পলা।

'আজ কোথায় যেতে চাও বলো।'

'কেন, কলোসিয়াম দেখার কথা না আজ?'

হেসে মাথা নেড়ে সায় জানালো রবিন। বললো, 'চলো পাতাল রেলে যাই। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।'

স্টেশনের সিড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় রবিন লক্ষ্য করলো রোম ধনীদের শহর হলেও এখানে গরিব মানুষও কম নয়। টুকটুকে দেড় বছরের বাচ্চা কোলে নিয়ে সিড়িতে বসে ভিক্ষা চাইছে কম বয়সী এক মা। বাচ্চাটাকে দেখে মনে হলো ভ্যাটিকান চার্চের দেয়ালে আঁকা দেবশিশু বুঝি। কোঁকড়া সোনালী চুল, স্বচ্ছ নীল বড় বড় চোখ, টুকটুকে গাল দুটো— দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। মেয়েটাও সুন্দরী, যদিও পরনে মলিন পোষাক, জুতোও ছেঁড়া, রুক্ষ বাদামী চুল আর বিষণ্ন মুখে ময়লার দাগ। কাছে এসে রবিনের পা আটকে গেলো। এত লোকজন সিড়ি বেয়ে ওঠা নামা করছে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। বাচ্চাটার গায়ে শুধু সুতির দুটো জামা, খালি ফিডিং বটল নিয়ে মায়ের কোলে বসে খেলছে।

রবিনকে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটা কী যেন বললো। রবিন বুঝতে পারে নি দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো, 'আমাকে একটা ডলার দেবে? আমার জন্য নয়, বাচ্চাটাকে দুধ কিনে খাওয়াবো।'

পলা চাপা গলায় রবিনের কানে কানে বললো, 'সব মিছে কথা, মেয়েটা মদ

খাওয়ার জন্য ভিক্ষে চাইছে।'

রবিনকে নিরুত্তর দেখে মেয়েটা আবার বললো, 'আজ সকাল থেকে বাচ্চাটা কিছু খায় নি।'

মেয়েটার চোখ দেখে মনে হলো বুঝি কেঁদে ফেলবে। রবিনের বুঝতে অসুবিধে হলো না, এভাবে একজন বিদেশীর কাছে ভিক্ষে চাইতে কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার। পকেট থেকে পাঁচ হাজার লিরার একটা নোট বের করে মেয়েটাকে দিলো। যা চেয়েছে তার চারগুণ পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো মেয়েটা। চোখের ভেতর যে পানিটা জমেছিলো ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়লো ওর দু'গাল বেয়ে। বাচ্চাটাকে বসিয়ে রেখে ছুটে গেলো পাশের ড্রিংকস-এর দোকানে। এক বোতল দুধ কিনে এনে কিছুটা ঢেলে দিলো বাচ্চার ফিডিং বটলে। রবিনের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কৃতজ্ঞ গলায় বার বার বললো, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।'

দুধ পেয়ে বাচ্চাটার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বুকের ভেতর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো রবিন। নিজের দেশের কথা মনে হলো। বাংলাদেশে এরকম লক্ষ লক্ষ শিশু রয়েছে সারাদিনে যারা এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না। পলা রবিনের হাত ধরে আস্তে আস্তে বললো, 'আমি ভুল বুঝেছিলাম রবিন। চলো যাই।'

কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরে দেখলো রবিন। মায়ের কোলে দুধ খাচ্ছে বাচ্চাটা, মা গভীর মমতায় চেয়ে দেখছে। গতকাল ভ্যাটিকান চার্চের গায়ে এরকম এক মমতাময়ী মায়ের ছবি দেখেছিলো রবিন।

পাতাল রেলে টারমিনি থেকে কলোসিয়াম আসতে মিনিট দশেক লাগলো। পলা বললো, 'বাসে এলে আধঘন্টা লাগতো। রাস্তা এ সময় অসম্ভব জ্যাম থাকে।'

কলোসিয়ামের বাইরে ছোট ছোট ফেরিওয়ালা ভিউকার্ড, স্লাইড, আর হালকা পেতলের স্যুভেনির বিক্রি করছে। নীল আর রীনের জন্য কিছু স্লাইড আর কলোসিয়ামের দু'রকম দুটো মেটালের প্রতিকৃতি কিনলো। পলার পছন্দ হয়েছিলো চ্যারিয়টে জুলিয়াস সিজারের প্রতিকৃতি খোদাই করা চেইনে ঝোলানো লকেট। দশ হাজার লিরা দিয়ে ওটা কিনে পলাকে উপাহার দিতেই ওর সারা মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লকেটটা গলায় পরলো বললো, 'ভালো লাগছে না দেখতে?'

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সায় জানালো রবিন।

কলোসিয়াম দেখার জন্য প্রচুর পর্যটক ভিড় করেছে। রবিনের মনে হলো পৃথিবীর সব দেশের মানুষ পাওয়া যাবে এদের ভেতর। অনেকে এসেছে দল বেঁধে। নানা ভাষায় ইটালিয়ান দোভাষীরা তাদের সব বুঝিয়ে বলছে। নাফিসার দেয়া গাইড বই মিলিয়ে দেখতে এতটুকু অসুবিধে হলো না রবিনের। দু'ঘন্টা ধরে ওরা ঘুরে দেখলো রোমান সম্রাট আর অভিজাতদের খেলাধূলো দেখার জন্য বানানো সেই ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শন। ক্লান্ত হয়ে ওরা ছোট্ট একটা বেদির মত উঁচু জায়গায় বসলো। ষ্টেশন থেকে দুটো কোক-এর ক্যান কিনেছিলো রবিন। কোক খেতে খেতে হালকা গলায় ও দারুণ সাজগোজ করা একটা মেয়ে দেখিয়ে রসিকতা করলো— 'মনে হচ্ছে ইটালীর মেয়েরা ফরাসী মেয়েদের চেয়ে বেশী সুন্দরী।'

পলা রবিনের রসিকতা বুঝতে পেরে বললো, 'তুমি কী করে বুঝলে ওই মেয়েটা ইটালিয়ান? আমি বাজি ধরে বলতে পারি ও ফরাসী।'

ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো ওদেরই বয়সী উলের ছোট স্কার্ট পরা মেয়েটা। একটা উঁচু জায়গা থেকে দশ এগারো বছর বয়সী ভাইটাকে লাফাতে দেখে ধমক দিয়ে কি যেন বললো। পলা শুনে হতাশ হলো— 'হায় ঈশ্বর, এ যে দেখি জার্মান!'

'তুমি কটা ভাষা জানো পলা?' জানতে চাইলো রবিন।

'ফরাসী ছাড়া ইংরেজি আর ডাচ ভালো জানি। জার্মান কাজ চালানোর মত বলতে পারি, লিখতে পারি না। তুমি?'

'ইংরেজি ছাড়া আর কোন বিদেশী ভাষা জানি না। তবে ভিসি আর-এ হিন্দি ছবি দেখে বুঝতে পারি।'

'আমার খুব ইণ্ডিয়া দেখার সখ।'

'চলে এসো। বাংলাদেশে আমার অতিথি হতে পারবে।'

পলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে রবিন! আজ তোমার সোফিয়া না গেলে হয় না?'

'আমি দুঃখিত পলা। ঢাকা থেকে কনফার্ম করা টিকেট। তাছাড়া সোফিয়া যাওয়াটাও জরুরি।'

'তুমি কি সত্যিই আমার কথা মনে রাখবে রবিন?'

নরম গলায় রবিন বললো, 'নিশ্চয় মনে রাখবো পলা।'

'তুমি আমার জন্য এত কিছু করলে, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।' বিষণ্ন গলায় বললো পলা।

রবিন মৃদু হাসলো— 'বন্ধু হতে গেলে এতসব হিসেব করা চলে না পলা।'

বিদেশী ছেলেটার কথায় পলার মন ভরে গেলো। লিয়ঁতে ওর অনেক ছেলে বন্ধু আছে। একদিনের পরিচয়ে রবিন ওর জন্য যতটা করেছে, ওর বহুদিনের পুরোনো বন্ধুরাও কেউ কখনো ততটা করে নি। বললো, 'তোমার মনটা ফুলের মত নরম। স্টেশনের বাচ্চা মেয়েটার দুধ কেনার জন্য তুমি টাকা দিয়েছো, অথচ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছিলো না ওর দিকে।'

রবিন আস্তে আস্তে বললো, 'আমি এসেছি পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ থেকে। গরিবদের কষ্ট আমি বুঝি পলা।'

ওরা দু'জন বিকেল পর্যন্ত পুরোনো রোমে পায়ে হেঁটে ঘুরলো। সাড়ে চারটার দিকে পলাকে নিয়ে ঘরে ফিরলো রবিন। নাফিসা তখনো ফেরেন নি। এ্যাপার্টমেন্ট দেখে পলা মুগ্ধ হয়ে গেলো— 'তোমার আন্টি রীতিমতো বড়লোক মনে হচ্ছে!'

রবিন বললো, 'বড় চাকরি করেন, একা থাকেন, তাই এত সৌখিন জিনিষপত্র কিনতে পেরেছেন।'

নাফিসা এলেন ঠিক পাঁচটায়। হাতে একটা প্যাকেট। ইটালিয়ান মহিলাটি এর মধ্যে ওদের কফির সঙ্গে পাস্তা ভেজে দিয়েছেন। নাফিসাও বসে পড়লেন। পলাকে একজন ভালো বন্ধু বলে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো রবিন। নাফিসা খুশি হলেন।

বললেন, 'তোমার থাকার অসুবিধের কথা রবিন বলেছে। ও আজ চলে যাচ্ছে। তুমি যে কদিন রোমে আছো ইচ্ছা করলে আমার এখানে থাকতে পারে পলা।'

রবিন আর পলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'ইউ আর রিয়েলি গ্রেট আন্টি।'

নাফিসা লাজুক হেসে বাইরে থেকে আনা প্যাকেটটা খুললেন। রবিনের জন্য চমৎকার স্যুট, টাই, শার্ট আর জুতো এনেছেন। পলা বললো, 'দেখেই মনে হয় খুব দামী স্যুট।'

রবিন একবার বললো 'এর কী দরকার ছিলো', আবার বললো, 'মাপ পেলেন কোথায়?'

'তোমার প্যান্ট জ্যাকেট সবই তো ওয়ার্ডরোবে। মাপ পাওয়া কি কঠিন কাজ!' নাফিসা মৃদু হেসে বললেন, 'রোমে এসে দুনিয়ার সবাই স্যুট বানায়। ইটালীর জুতো পৃথিবী বিখ্যাত। এই সামান্য জিনিসও কি উপহার দিতে পারবো না আমার লক্ষী ছেলেটাকে!'

রবিন লক্ষ্য করলো নাফিসা আন্টি কত সহজে ওকে আমার ছেলে বললেন। পলা অত কিছু বুঝলো না। বললো, 'আন্টি, আমি কি আপনার সঙ্গে এয়ারপোর্ট যেতে পারি রবিনকে সি অফ করার জন্য?'

'নিশ্চয় পারো পলা। ফেরার সময় হোটেল থেকে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে নিও।'

নাফিসার কথা রবিন পলাকে বলেছে। পলা খুব অবাক হলো— বন্ধুর ছেলের দু'দিনের বান্ধবীকে কত সহজে আপন করে নিলেন এই অপূর্ব সুন্দরী এবং দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। ওর মনে হলো বাংলাদেশের সব মানুষ বুঝি এমন মহৎ হৃদয়ের। রবিনকে বললো, 'ভবিষ্যতে কখনো সুযোগ পেলে সবার আগে আমি বাংলাদেশে যাবো। তোমাদের মত এত সুন্দর হৃদয়ের মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।'

নাফিসা মৃদু হেসে বললেন, 'পৃথিবীর সব দেশেই ভালো মানুষ আছে পলা। একমাত্র মানুষই পারে একে অপরকে সাহায্য করতে, বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়াতে।'

পলা বিড় বিড় করে বললো, 'এই মানুষই আবার যুদ্ধের নামে মানুষকে হত্যা করে, সভ্যতা ধ্বংস করে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জঘন্য সব কাজ করে।'

রবিন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আমি ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি। যাবার সময় তো হয়ে এলো।'

সাড়ে পাঁচটার আগেই ওরা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলো। চেক ইন করে রবিনের স্যুটকেস পাঠিয়ে দিয়ে নাফিসা বললেন, 'ফেরার সময় তুমি সাতদিন রোমে কাটাবে, আমি তোমার বাবাকে বলে রাখবো রবিন। তুমি রোমে ফেরার টিকেট কনফার্ম করে আমাকে ফোন করবে।'

বলকান এয়ারের যাত্রী যারা বুখারেস্ট হয়ে সোফিয়ায় যাবে তাদের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাবার ডাক এলো। বিদায় জানাতে গিয়ে নাফিসা রবিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পলা হাত মেলাতে গিয়ে রবিনের হাত চেপে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। দু'জনেই

বললো, 'ভালো থেকো রবিন। তোমার ফেরার অপেক্ষায় রইলাম।'

ইমিগ্রেশনের দরজা দিয়ে ঢোকার মুহূর্তে রবিন পেছনে তাকিয়ে দেখলো, নাফিসা আর পলা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দু'জনের চোখে ওর জন্য শুধু গভীর মমতা আর ভালোবাসা।

সোফিয়ায় রবিন ও রহস্যময় প্রফেসর

বয়ানা থেকে বিকেলের আগেই সোফিয়ায় ফিরে এসেছিলো নীল। ঘরে ফেরার পর থেকে ওর মন খারাপ। বাস থেকে নামতে যাবে— হন্তদন্ত হয়ে এক বেয়াক্কেল বুড়ো ওকে একরকম ধাক্কা দিয়েই নেমে গেলেন, যেন আগের ষ্টপেজে নামার কথা ছিলো, ভুলে এখানে চলে এসেছেন। নামার সময় নীলের হাতে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে ফিস ফিশ করে বললেন, 'সাবধান, পেছনে গোয়েন্দা।'

চমকে উঠে কাগজের পুটলিটা তখন পকেটে রেখে দিলো নীল। বুড়োর পেছন পেছন হন্তদন্ত হয়ে সেও নেমে গেলো। ঠিক তখনই একটা বাস ছাড়লো বুলেভার্ড দিমিত্রভের রুটে। চলতি বাসে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো নীল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওর পেছন পেছন আসছিলো সেই মহিলা, যাকে ও প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারনি ভেবেছিলো, বাসে উঠতে না পেরে কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

নীলের তখনই মনে হয়েছে ওকে ওরা চিনে ফেলেছে। দু'বার বাস বদল করে বাড়ি ফেরার পথে সন্দেহজনক আর কাউকে ওর চোখে পড়লো না। তবু মনে হলো, আড়াল থেকে কেউ ওর গতিবিধি লক্ষ্য করেছে। নিজের বোকামির কথা ভেবে সারা বিকেল মন খারাপ করে বসে রইলো। বাবার কাছে কথাটা কিভাবে পাড়বে তাও ভেবে পেলো না। কথাটা মা কিম্বা রীনের সামনে বলা যাবে না। এম্ব্যাসি থেকে ফেরার পর বাবাকে একা পাওয়াও কঠিন। বাবা এ সময়টা সবার সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করেন। সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করতে নীলেরও খুব ভালো লাগে। সেদিন মনে হচ্ছিলো অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাবাকে একা পাওয়া দরকার। রিস্টোরদের বিপদের চিন্তায় সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়েছিলো সে।

বাবা এলেন সাড়ে পাঁচটার দিকে। সবার সঙ্গে বসে চা খেলেন। রীন কদিন ধরে খুব ব্যস্তা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান নিয়ে। বুলগেরিয়ায় বাংলাদেশী ছাত্রদের সমিতির সভাপতি সুভাষদা ওকে বলেছেন 'কারার ওই লৌহ কপাট'-এর সঙ্গে নাচটা তিন দিনে

কাউন্সিলার গিন্নি নাজমা খালার কাছ থেকে ভালোভাবে শিখে নিতে। চা খেয়েই রীন উঠে চলে গেলো নিজের ঘরে। মা বাবাকে বললেন, 'তোবারককে বলেছো আটটার ভেতরই যেন চলে আসে?'

বাবা বললেন, 'ও সাতটার ভেতরই আসবে। ফ্লাইট তো দশটায়।'

মা নীলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রবিনকে আনতে এয়ারপোর্ট যাবে?'

মা'র কথা শুনে নীলের মনে পড়লো রাতের ফ্লাইটে রবিনদার আসার কথা। ব্যস্ত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ মা। নিশ্চয়ই যাবো।'

'রবিন নার্গিসি কোফতা খেতে পছন্দ করে। যাই, ওর জন্য কটা কোফতা বানাই। মা মরা ছেলেটা, যা একটু আবদার সেই ছোটবেলা থেকে আমার কাছেই করে।' এই বলে মা উঠে পড়লেন।

বাবা গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললেন, 'মা আমারও নেই। আমি যেন কোফতার ভাগ পাই।'

মার সঙ্গে বাবাকে রসিকতা করতে দেখে মজা পেলো নীল, বললো, 'বা রে! মা আছে বলে কি আমি আর রীন কোফতার ভাগ পাবো না?'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'বলেছি নাকি তোমাদের দেবো না!'

বাবার মন এখন ভালো আছে। মা রান্নাঘরে যাওয়ার পর নীল বললো, 'বাবা তোমাকে একটা অনুরোধ করবো, বলো রাখবে?'

হাসি চেপে গম্ভীর গলায় বাবা বললেন, 'নিশ্চয় রাষ্ট্রের কোনও অতি গোপনীয় তথ্য ফাঁস করতে বলবি না।'

'না বাবা। আমার এক বন্ধু খুব বিপদে পড়েছে। তোমাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলছি।' এই বলে নীল রিস্টো আর রিস্টোর বাবার বিপদের কথা যা শুনেছে সব বাবাকে বললো। ওর মার সঙ্গে দেখা করতে গোপনে বয়ানা গিয়েছিলো সে কথাও বললো। শেষে বললো রিস্টোর মার অনুরোধের কথা।

সব কথা শুনে বাবার কপালে ভাঁজ পড়লো। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বুড়ো, তুমি এমন একটা কাজে জড়িয়েছো— এসব দেশে যা খুবই বিপদজনক। আমার ছেলে হয়ে এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যাপারে তোমার জড়ানো মোটেই উচিত হয় নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো নীল। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'বাবা, এদের রাজনীতির ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। রিস্টো আমার খুবই কাছের বন্ধু। ওর এত বড় একটা বিপদ আমি কিছু করবো না, এ কথা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে।'

'বুঝতে পেরেছি।' বলে বাবা কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর নীল বললো, 'বাবা, তুমি অন্তত ওদের কথাটুকু শোনো। আমি বলেছি কথা শুনতে তুমি আপত্তি করবে না।'

'ঠিক আছে, কাল বিকেলে ওদের কাউকে দেখা করতে বলো। একজনের বেশি নয়, পরিচয় দেবে ব্যবসায়ী হিসেবে। আমার ধারণা এম্ব্যাসির বুলগেরিয়ান স্টাফদের কেউ গোয়েন্দা বিভাগের হতে পারে।'

সোফিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে বুলগেরিয়ান স্টাফ তিনজন। একজন রাষ্ট্রদূতের

একান্ত সচিব ইলিনা মিরকোভা, একজন দোভাষী, আরেকজন রিসেপশনিস্ট। নীল ভেবে পেলো না এদের ভেতর কে সরকারী গুপ্তচর হতে পারে। তবু বাবার কথা শুনে নীল আশ্বস্ত হলো— যাক রিস্টোর জন্য একটা কাজ অন্তত করতে পেরেছে।

সারাদিন উত্তেজনা আর উদ্বেগের ভেতর কাটানোর পর নিজেকে ভারমুক্ত মনে হলো নীলের। তোবারক আসার পর ওর সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক ব্যাডমিন্টন খেললো। খেলার শেষে বুড়ো ওক গাছের নিচে রাখা পাথরের হেলান দেয়া বেঞ্চে বসে তোবারক জিজ্ঞেস করলো, 'সকালে যে কোন জায়গায় গেলেন, কাজ হইছে?'

'হয়েছে।' মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে নীল প্রসঙ্গ পাল্টালো— 'আমাদের এম্ব্যাসিতে যে বুলগেরিয়ান ষ্টাফরা আছে, এদের তোমার কেমন লাগে তোবারক ভাই?'

'কেন, ভালোই তো লাগে। ইলিনা মিরকোভা আমারে বেশ কয়েকদিন বাড়িতে নিয়া খাওয়াইছে।' বলে হঠাৎ লজ্জা পেলো তোবারক। ওর টকটকে ফর্শা গালে লাল রঙের ছায়া নীলের চোখ এড়ালো না।

'এদের মধ্যে কাউকে সন্দেহজনক কিছু করতে দেখেছো?' সাবধানে জানতে চাইলো নীল।

কিছুক্ষণ ভেবে তোবারক বললো, 'গত দুই তিন মাস যাবৎ ইলিনা ছুটির পরও এক দেড় ঘন্টা অফিসে থাকে। আমারে একদিন জিজ্ঞাসা কইরলো, স্যারের বাসার পার্টিতে কারা আসে। বিশেষ করি অন্য এম্ব্যাসি আর ফরেন অফিসের বাইরে বুলগেরিয়ান কারা আসে জানতে চাইছিলো। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কইরলেন নীল বাই?'

'কারণ আছে, পরে বলবো। ইলিনা ছাড়া অন্য দু'জন?'

'ইন্টারপ্রিন্টার দিমিত্রি কারো সাথে ফাঁচে থাকে না। ঘড়ি ধরি অফিসে আসে, ছুটির পর এক মিনিটও থাকে না। রাইতে স্যারের লগে ডিউটি থাইকলে আলাদা কথা। রিসিফশনিস্ট নাইকোভা একটু দেমাগী টাইফের। কারো লগে বেশি কথাবার্তা কয় না। তবে ইলিনারে দুই চোখে দেখতে ফারে না।'

তোবারকের কথা শুনে ইলিনার আচরণই মনে হলো সন্দেহজনক। সেদিন ইলিনা নিজেকে সিটিযেন কমিটির লোক বললো। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে এই গোপন পরিচয় ওদের জানাবার প্রয়োজন ছিলো না। নীলের মনে হলো নিজের আসল পরিচয় গোপন করার জন্য ইলিনা মিথ্যে বলেছো। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করলো সন্দেহের কথাটা বাবাকে এক ফাঁকে জানিয়ে দিতে হবে।

রোম থেকে নাফিসা দুপুরে ফোন করে দূতাবাসে জানিয়ে দিয়েছিলেন রবিন কখন সোফিয়া পৌছবে। নীল আর তোবারক প্লেন আসার দশ মিনিট আগে এয়ারপোর্ট পৌছলো। নীলকে লাউঞ্জে দাঁড় করিয়ে রেখে তোবারক ভেতরে ঢুকে গেলো। দূতাবাসে যারা কাজ করে তাদের সবার ভেতরে যাওয়ার পাশ আছে।

ঠিক দশটায় বলকান এয়ার-এর রোম- বুখারেস্ট- সোফিয়া ফ্লাইট এসে ল্যাণ্ড করলো। রবিন প্লেন থেকে নেমে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ইমিগ্রেশন কাউন্টারের লাইনে এসে দাঁড়ালো। ভেবেছিলো কাস্টমস সেরে লাউঞ্জে গেলে নিশ্চয় নীল রীনদের দেখা পাবে। এমন সময় স্মার্ট, সুন্দর দেখতে এক যুবককে দেখলো ওর দিকে আসতে।

চেহারা দেখে মনে হয় গ্রীক কিম্বা ইটালিয়ান— কাছে এসে নির্ভেজাল বাংলায় বললো, 'আপনি কি স্যার রবিন?'

রবিন বুঝলো এম্ব্যাসির কোন ষ্টাফ হবে। ওর কথার ধরনে রবিন হেসে ফেললো— 'আমি স্যার রবিন নই, শুধু রবিন।'

তোবারক হাত বাড়িয়ে বললো, 'আমার নাম তোবারক আলী, বাংলাদেশ এম্ব্যাসি থেকে আসছি। ওয়েলকাম টু সোফিয়া স্যার। আপনার পাসপোর্টটা আমারে দেন।'

স্মার্ট তোবারককে ভালো লেগে গেলো রবিনের। হাত মিলিয়ে মৃদু হাসলো— 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুবই খুশি হলাম তোবারক সাহেব।' এই বলে টিকেট আর পাসপোর্ট তোবারককে দিলো।

তোবারককে সাহেব বলাতে ও লাজুক হাসলো। রবিনের টিকেট আর পাসপোর্ট নিয়ে ডিপ্লোম্যাট লেখা খালি কাউন্টারে চলে গেলো। নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বুলগেরিয়ান ভাষায় কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার থেকে রবিনের পাসপোর্টে সিল মেরে ফেরত দিলো। তোবারক ওকে নিয়ে গেলো লাগেজ আসার জায়গায়।

টিকেটের সঙ্গে রবিনের স্যুটকেসের ট্যাগ নম্বর লাগানো ছিলো। কনভেয়ার বেল্টে রবিন ওর স্যুটকেসটা দেখে হাত বাড়াতে যাবে ওকে— সরিয়ে তোবারকই ওটা তুলে নিলো। তারপর বেরিয়ে এলো লাউঞ্জে।

ওদের দেখে— 'রবিনদা', বলে ছুটে এলো নীল। রবিন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুই কত লম্বা হয়েছিস নীল। মনে হয় সামনের বছর আমাকে ছুঁয়ে ফেলবি।'

নীল হেসে বললো, 'তুমি আগের চেয়ে অনেক হ্যাণ্ডসাম হয়েছো। এখনও কি আগের মত ফুটবল খেলো?'

'কবে ছেড়ে দিয়েছি! ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পর আর বলের সঙ্গে পা ছোঁয়াই নি। তুই খেলিস এখনো?'

রবিনের প্রশ্নের জবাব দিলো তোবারক। গর্বিত গলায় বললো, 'নীল বাই স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন।'

মৃদু হেসে নীলের পিঠ চাপড়ে দিলো রবিন। ওরা বাইরে এসে গাড়িতে উঠলো। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালালো তোবারক। নীলের কানের কাছে মুখ নিয়ে রবিন ফিশ ফিশ করে বললো, 'তোবারক কি এম্ব্যাসির ড্রাইভার?'

নীল মাথা নেড়ে সায় জানালো। ওর দু'চোখে প্রশ্ন। রবিন আগের মত চাপা গলায় বললো, ' যে রকম চেহারা ভেবেছিলাম কোনও ডিপ্লোম্যাট হবে।'

নীল কোন কথা না বলে মুখ টিপে হাসলো শুধু। পনেরো মিনিটের ভেতর ওরা বাড়ি পৌঁছে গেলো।

গাড়ির শব্দ শুনে রীন ছুটে বেরিয়ে এলো। পেছনে ওদের বাবা মাও এলেন। রবিন গাড়ি থেকে নেমে ওর চাচাকে পা ধরে সালাম করতে যাবে— তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চাচী ওর কপালে চুমো খেলেন। বললেন, 'মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। নীল ওকে নিয়ে ওপরে যা। মুখ হাত ধুয়ে খেতে আয় তোরা।'

রীনকে দেখে অবাক হলো রবিন— 'আরো, একি! রীন কত বড় হয়ে গেছে। তিন

বছর আগে ললিপপ খাওয়া ছোট্ট মেয়েটিকে একজন গর্জিয়াস প্রিন্সেস মনে হচ্ছে।'

রীন লজ্জায় লাল হলো। নীল বললো, 'মাথায় বাড়লে কি হবে রবিনদা! রীন এখনো চুইংগাম আর ললিপপ খায়।'

রাগতে গিয়ে হেসে ফেললো রীন— 'ঠিক আছে দাদা, মনে থাকবে কথাটা। আরেকদিন আসিস চকলেটের ভাগ চাইতে।'

রবিন ভুরু কুঁচকে হাসি চেপে বললো, 'তাই নাকি নীল?'

'ওর যেমন কথা!' এবার লজ্জা পেলো নীল— 'চলো ওপরে যাই।'

তোবারক এসেই রবিনের স্যুটকেসটা নীলের ঘরে রেখে এসেছিলো। ওখানেই রবিনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। নিচের তলায় অবশ্য দুটো গেষ্ট রুম ছিলো। একটা সাজানো গোছানো, বেশ বড়। কোন অফিসিয়াল গেস্ট এলে ওখানে থাকেন। আরেকটা ছোট, সাদামাটা— তোবারক বা অফিসের কেউ দরকার হলে থাকে। নীলের মা অবশ্য প্রথমে বড় গেষ্ট রুমে রবিনের থাকার কথা বলেছিলেন, বাবা মানা করেছেন— 'হঠাৎ যদি হোমরা চোমরা কেউ এসে পড়ে।' তাছাড়া নীলও বলেছে, 'একটা এক্সট্রা খাট দিয়ে দাও, রবিনদা আমার ঘরে থাকবে।'

রবিন যে ছাত্র রাজনীতির সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত এ কথা নীলের অজানা নয়। ও ঠিক করেছে বুলগেরিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে রবিনের সঙ্গে কথা বলবে।

অন্যদিন ন'টার ভেতর সবার রাতের খাওয়া হয়ে যায়। সেদিন রবিনের জন্য সবাই দশটা চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলো। খেতে বসে রবিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো— 'সেই কবে নার্গিসি কোফতা খেয়েছিলাম। চাচী কী করে বুঝলেন, এটা আমার প্রিয় খাবার?'

স্নেহভরা চোখে রবিনকে দেখলেন ওর চাচী। বললেন, 'ছেলেদের পছন্দ অপছন্দের কথা কোনও মা ভুলে থাকতে পারেন না।'

খেতে খেতে রবিন বললো, 'রোজ এরকম খেলে দশদিনে কম করে হলেও পাঁচ পাউণ্ড ওজন বাড়বে।'

'তোমার এমন কি ওজন হলো যে ও নিয়ে ভাবতে হবে!' চাচী বললেন, 'পাঁচ কেন, দশ পাউণ্ড বাড়লেও ক্ষতি হবে না।'

নীল মুখ টিপে হেসে বললো, 'ভয় কি রবিনদা। খেলা তো ছেড়েই দিয়েছো।'

তোবারক মন্তব্য করলো, 'খেলা ছাড়লে কি হইবো। রবিনদার বডি স্টাকচার খুব সোন্দর।'

ওদের সবার কথা শুনে রবিন হাল ছেড়ে দিলো। ওর চাচী ওকে প্রাণভরে খাওয়ালেন।

খাওয়া শেষ করে হাঁসফাস করতে করতে নীলের সঙ্গে দোতালায় এলো রবিন। বললো, 'সত্যি বলছি, নীল, এভাবে খেলে আমাকে অকালে পটল তুলতে হবে।'

'কোত্থেকে তুলবে রবিনদা?' নিরীহ গলায় নীল বললো, 'এসব দেশে পটল কী জিনিস কেউ চোখে দেখে নি।'

'দেবো এক থাপ্পড়!' হেসে ফেললো রবিন। সঙ্গে নীলও।

রোমের চেয়ে সোফিয়ায় শীত অনেক বেশি মনে হলো। বিছানায় উঠে বসে গায়ে কম্বল জড়িয়েও পুরোপুরি শীত তাড়াতে পারলো না রবিন। এমন সময় রীন এলো আরেকটা কম্বল হাতে। বললো, 'রবিনদা, এটাও গায়ে দিও। সোফিয়ার শীত টের পাবে আর কদিন পর। আমাদের হিটিং সিস্টেম কাজ করছে না।'

দুটো কম্বল গায়ে দিয়ে আরাম হলো রবিনের। নীল বললো, 'ওয়েদার অফিস বলেছে, শীত এবার বেশি পড়বে।'

'তার আগেই আমি কেটে পড়তে চাই।' রবিন বললো, 'কড়া শীত আমি খুবই অপছন্দ করি।'

রীন বললো, 'রবিনদা, রাতে তুমি চা, কফি কিছু খাও?'

'এরকম শীতে মনে হয় গরম এক কাপ কফি ভালোই লাগবে। কি বলিস নীল?'

নীল হাসলো— 'তুমি খাও। আমার পোষাবে না।'

'আমি এক্ষুণি আনছি।' বলে রীন চলে গেলো।'

'তুমি সোফিয়ায় কত দিন থাকবে রবিনদা?' জানতে চাইলো নীল।

'সপ্তাহ খানেকের বেশি নয়।'

'টিকেট কি কনফার্মড?'

'না, কাল পরশু করে ফেলবো। চিনিস বলকান এয়ার-এর অফিস?'

'তা চিনি। তবে আরও কিছুদিন থেকে যাও রবিনদা। দারুণ এক সময়ে তুমি সোফিয়া এসেছো।'

'শুনলাম রোমে এসে। আমারও জানার ইচ্ছে আছে অনেক কিছু।'

রীন কফি বানিয়ে আনলো। ঘরে ঢুকেই নীলকে বললো, 'দাদা, তোর টেলিফোন।'

'এত রাতে টেলিফোন।' রবিন রসিকতা করে বললো, 'কোন বান্ধবী নয় তো!'

নীল টেলিফোন ধরতে গেলো। রীন হেসে বললো, 'ও কোত্থেকে বান্ধবী পাবে?' আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ও টমাটোর মত লাল হয়ে যায়।'

'নীলের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় তোর বুঝি কান লাল হয় না।'

'বয়ে গেছে।' উঠে পড়লো রীন— 'শুতে যাচ্ছি রবিনদা। কাল ভোরে উঠতে হবে। গুড নাইট।' বলে রীন চলে গেলো।

নীলকে ফোন করেছিলেন রিস্টোর মা। 'হ্যালো' বলতেই একজন মহিলার গলা শুনলো— 'আমি ইরিনা।' ইংরেজিতে বললেও রীন বুঝলো বুলগেরিয়ান কেউ হবে।

নীল মনে করতে পারলো না ইরিনা কে। বললো, 'আমি নীল বলছি, আপনি কি আমাকে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, বাছা, তোমাকেই চাইছি। তুমি কি ভুলে গেলে অভাগী মাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে নীলের মনে পড়লো রিস্টোর মা'র কথা। সকালে তিনিই তো বলেছিলেন ফোনে ইরিনা বলবেন। নীল বিব্রত হয়ে বললো, 'আমি দুঃখিত। এবার চিনতে পেরেছি। কাল বিকেল চারটায় একজন ব্যবসায়ী দেখা করতে পারেন।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে গেলো। নীল একটু অবাক হলো। এভাবে হঠাৎ লাইন কাটলো কেন? ওদের টেলিফোন কি ট্যাপ করা হচ্ছে?

চিন্তিত মুখে ওপরে উঠে এলো নীল। রবিন বললো, 'কার টেলিফোন নীল? কোন খারাপ খবর?'

কাষ্ঠ হেসে নীল বললো, 'আমার পরিচিত একজন। না, কোন খারাপ খবর নয়।'

'বারোটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। তুই কটায় ঘুমাস?'

'বারোটা, সাড়ে বারোটা। কেন তোমার ঘুম পাচ্ছে?'

'আরে না। ভাবছি তোর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবো।'

'তোমাদের মার্কোসের খবর কি বলো। হটাচ্ছো কবে?'

'বেশি দেরি নেই। মুশকিল হলো দুই কোরাজন নিয়ে। নইলে কবেই ফেলে দিতাম।'

'খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনার ভেতর তুমি কাকে সাপোর্ট করো?'

'আমি কাউকেই করি না। ওদের পার্টি তো আগে ক্ষমতায় ছিলো। তখন তারা কী করেছে কারো জানতে বাকি নেই।'

'তবু নেতা বলতে ওরাই তো। আমাদের বাড়িতে খুব মজা। বাবা খালেদাকে সাপোর্ট করেন, মা হাসিনাকে।'

'আর তুই?'

'আমি পলিটিক্স নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার এক বুলগেরিয়ান বন্ধু আছে— রিস্টো নাম। ও খুব পলিটিক্স করে।'

'কী পলিটিক্স করে তোর বন্ধু?'

'ঝিভকভকে হটাবার জন্য সিটিযেন কমিটি হয়েছে একটা। রিস্টো ওদের সঙ্গে আছে। ওর বাবা কমিটির একজন নেতা।'

'আলাপ করা যায় না ওদের সঙ্গে?'

'তুমি আলাপ করবে ওদের সঙ্গে?' ভীষণ অবাক হলো নীল— 'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব কঠিন। নেতারা সব লুকিয়ে আছে।'

'তোর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে বলিস, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। জানতে চাই ওরা আসলে কী চায়।'

'যদি দেখা হয় বলবো। হঠাৎ ওদের জানতে চাইছো কেন?'

রবিন গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমার জানা দরকার পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র কেন মার খাচ্ছে। এতদিন সমাজতন্ত্রের কথা বলে এসেছি— সবই কি মিথ্যে?'

'বাবার সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলতে পারো। এখানকার রাজনীতির অবস্থা বাবা ভালো জানেন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। চাচা নিশ্চয় কমিউনিস্ট পার্টির কোন নেতার সঙ্গেও দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?'

'হয়তো পারবেন। সত্যি করে বল তো রবিনদা, আমাদের দেশে কমিউনিস্টরা কিছু করতে পারবে?'

'পারলে কমিউনিস্টরাই পারবে। তোর কেন মনে হচ্ছে পারবে না?'

'এখানকার অবস্থা দেখে। এখানে এমন লোক খুব কমই পাবে, যারা কমিউনিস্টদের সাপোর্ট করে।'

বুলগেরিয়ার অবস্থা নিয়ে নীলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললো রবিন। নীল যদিও বলেছে রাজনীতি বোঝে না, তবে ও যেসব কথা বললো সেগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে খুবই ভাববার কথা। নীল ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও রবিন এ নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলো।

রিস্টোদের বিপদের বোঝা বাবার ঘাড়ে চাপানোর পর থেকে নিজেকে বেশ হালকা মনে হচ্ছিলো নীলের। সকালে নাশতার টেবিলে রবিনকে বললো, 'চলো তোমাকে মাউন্ট ভিতুশা ঘুরিয়ে আনি। ভিতুশার চূড়া থেকে সোফিয়া শহরটাকে দারুণ দেখায়?'

রবিন আঁতকে উঠলো— 'তুই কি আমাকে মাউন্টেন ক্লাইম্বার ভেবেছিস?'

রবিনের কথার ধরনে রীন হেসে গড়িয়ে পড়লো। নীলও হেসে ফেললো— 'তোমার ক্লাইম্বার হওয়ার কোনো দরকার নেই। আমরা কেবল কার-এ চেপে পাহাড়ের চূড়ায় উঠবো।'

'তাহলে যাওয়া যেতে পারে।' রবিন হাঁপ ছেড়ে বললো, 'রীনও যাবে নিশ্চয়ই।'

'না রবিনদা।' ওপর নিচে মাথা নাড়লো রীন— 'আমার নাচের রিহার্সেল আছে।'

রীনের মাথা দোলানো দেখে অবাক হলো রবিন— 'রিহার্সেল আছে ভালো কথা। মুখে বলছিস— না, মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলছিস, এ আবার কেমনতরো কথা।'

'নীল আর রীন একসঙ্গে হেসে উঠলো— 'তোমাকে বলা হয় নি রবিনদা। আমরা যেভাবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ না বলি, বুলগেরিয়ানরা ঠিক উল্টোভাবে মাথা নাড়ে। যে কদিন এখানে আছো কথাটা মনে রেখো।'

'ঠিক আছে, মনে রাখবো,' বলে দুদিকে মাথা নাড়লো রবিন।

রীন বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।'

ওরা যখন নাশতার টেবিল ছেড়ে উঠলো নীলের বাবার তখন অফিসে যাওয়ার সময় হয়েছে। রবিনরা ভিতুশার দিকে যাচ্ছে শুনে বললেন, 'তোদের বাস স্টপেজ পর্যন্ত লিফট দিতে পারি।'

নীল মানা করলো— থাক বাবা, আমরা হেঁটেই যাবো। এইটুকুই তো পথ।'

রীন চলে গেলো বাবার সঙ্গে। কালকের মধ্যে ওর নাচ শেখা শেষ করতে হবে। তারপর শুরু হবে নাটকের রিহার্সেল। ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে নীল আর রবিন বেরিয়ে পড়লো। বেরুবার সময় রবিনকে ওর বাবার একটা ভিজিটিং কার্ড দিলো, বুলগেরিয়ান ভাষায় লেখা। বললো, 'কখনো কোন দরকার হলে ট্যাক্সিতে উঠে এই কার্ড দেখালে তোমাকে সোজা এম্ব্যাসি নিয়ে যাবে।'

সোফিয়ার বাসগুলো রবিনের কাছে মনে হলো রোমের চেয়ে কম আরামের নয়। ঢাকার মতো পাদানিতে ঝুলেও কেউ যাচ্ছে না। বাস ছাড়া রাস্তায় ট্রামও আছে অনেক। শুধু পাতাল রেলটা নেই। নীল শুনে বললো, 'ছোট শহর, লোকজনও বেশি নয়, পাতাল

রেল দিয়ে কী হবে।'

জীবনে প্রথম কেবল কার-এ চড়লো রবিন। ভিতুশা পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে নানা রঙের গাছের সমারোহ দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেলো। নীলকে বললো, 'এই বনে যত রকমের গাছ আছে, সবগুলো একটা করে পাতা দিবি আমাকে, গাছের নাম লিখে।'

'তোমাকে একদিন ফ্রিডম পার্কে নিয়ে যাবো। গাছ আর ফুল দেখে তোমার মন ভরে যাবে।'

'ফুল দেখে সময় কাটালে হবে না। মানুষও দেখতে চাই আমি, খুব কাছে থেকে।'

'ঠিক আছে।' মৃদু হেসে নীল বললো, 'মানুষও দেখাবো তোমাকে।'

ভিতুশা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সোফিয়ার দৃশ্য দেখার আগে আরেকটি দৃশ্য দেখে রবিনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। ঢাকা থেকে রোমে আসার সময় প্লেনে পরিচয় হওয়া বুড়ো প্রফেসর বরিস— যিনি ওর সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করেছিলেন রোমের পালাতিনোয়, তিনি এখানে! রবিন দেখলো দু'পাশে দুজন দশাসই চেহারার লোক প্রফেসরের কনুই চেপে ধরেছে। প্রফেসর যে ওদের সঙ্গে অনিচ্ছার সঙ্গে যাচ্ছেন, সেটা ওঁর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। সরল ছেলেমানুষি ভরা চোখে ভয় আর উদ্বেগ মেশানো, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিলো তাঁকে। রবিনদের তিনি দেখতে পান নি। পাহাড়ের চূড়ায় অনেক বিদেশী পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ওদের অসহায়ভাবে দেখছিলেন প্রফেসর। রবিন চাপা গলায় নীলকে বললো, 'চলতো ওদিকে। মনে হচ্ছে প্রফেসর বিপদে পড়েছেন।'

নীল অবাক হয়ে— 'কোন প্রফেসর', 'কার প্রফেসর', বলতে বলতে রবিনের পেছন পেছন এলো। রবিন দ্রুত পা চালিয়ে প্রফেসরের কাছে এসে বললো, 'সুপ্রভাত প্রফেসর বরিস। আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। বেড়াতে এসেছেন বুঝি ভিতুশায়?'

রবিনকে দেখে দু'পাশের লোক দু'টো ভুরু কুঁচকে প্রফেসরের হাত ছেড়ে দিয়েছে। প্রফেসর যেন গভীর পানিতে ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে একটা বড় অবলম্বন খুঁজে পেলেন। শক্ত করে রবিনের হাত চেপে ধরে বললেন, 'সুপ্রভাত বাছা, আমিও যে তোমাকে খুঁজছিলাম।' এরপর পাশের লোকদের বললেন, 'এ ছেলে আমার পুরোনো ছাত্র। এখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের অতিথি হয়ে এসেছে। আমি আপনাদের সঙ্গে পরে দেখা করবো। এর সঙ্গে আমাকে এখনই এক জায়গায় যেতে হবে।'

ওদের সঙ্গে প্রফেসর বুলগেরিয়ান ভাষায় কথা বলছিলেন। রবিন না বুঝলেও নীল বুঝে ফেললো, প্রফেসর গুপ্ত পুলিশের পাল্লায় পড়েছেন। পুলিশদের একজন প্রফেসরকে বললো, 'আমাদের সঙ্গে যাওয়াটা আপনার জন্য বেশি জরুরি।'

রবিনের হাত আঁকড়ে ধরে প্রফেসর ভীত গলায় বললেন, না আমি তোমাদের সঙ্গে এখন যাবো না।'

'আপনাকে আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে।' বলে ওরা শক্ত হাতে প্রফেসরের কনুই চেপে ধরলো আগের মত।

তখনই চিৎকার করে উঠলো নীল— 'খবরদার বলছি, হাত ছাড়ুন প্রফেসরের।

তিনি না গেলে কি জোর করে নেবেন? আপনারা কী পুলিশের লোক? ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের? দিনের আলোয় একজনকে কিডন্যাপ করতে এসেছেন, সাহস তো কম নয়! এক্ষুণি চিৎকার করে লোক জড় করবো আমি।'

নীলের চিৎকার শুনে কয়েকজন টুরিষ্ট কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এলো। লোক দুটো প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলো। তারপর কটমট করে তাকালো নীলের দিকে— পারলে ওকে ভস্ম করে দেয়। তারপর নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে চাপা গলায়— 'ঠিক আছে দেখে নেবো,' বলে ধুপধাপ করে হেঁটে চলে গেলো।

একজন আমেরিকান বুড়ো বললেন, 'আমি কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি?'

নীল হেসে বললো, 'না, ধন্যবাদ।' তারপর প্রফেসরকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'চলুন, এখানে একটা চমৎকার কাফে আছে, আমরা ওখানে গিয়ে বসি।'

প্রফেসর নীলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়েছি বাছা। তোমরা না এলে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলতো।'

রবিন এতক্ষণ পর কথা বলার সুযোগ পেলো— 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না প্রফেসর। আপনি কী করেছেন? কেন এরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়?'

বুড়ো প্রফেসর কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আরেকদিন বলবো। তোমরা আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছো। তোমাদের কথা আমি সব সময় মনে রাখবো। এখন আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। আমার কিছু বন্ধুর ভারি বিপদ।'

নীল বললো, 'আমরা কি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'আমাকে তোমরা আমার ট্যাক্সিটা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারো। পাজি দুটো কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে।'

'ট্যাক্সির ড্রাইভার কি আপনার চেনা?'

'হ্যাঁ চেনা।' মুচকি হেসে প্রফেসর নীলকে বললেন, 'তুমি শুধু সাহসী নও, দারুণ বুদ্ধিমানও।'

সেদিন রবিনের ভিতুশা পাহাড় দেখা হলো না। প্রফেসরকে ট্যাক্সিতে তুলে দিতে এসে দেখে লোক দুটো অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আশা করেছিলো প্রফেসরকে একা পাবে। ওদের দেখে রবিন আর নীলও প্রফেসরের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। প্রফেসর ড্রাইভারকে চাপা গলায় বললেন, 'আমেরিকান এম্ব্যাসি।'

দক্ষ ড্রাইভার পাহাড়ের চক্রপথে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পাঁচ মিনিটে নিচে নেমে এলো। স্ট্যামবুলেস্কি বুলেভার্ডে আমেরিকান এম্ব্যাসি আসতে ওদের মাত্র দশ মিনিট লাগলো।

সোফিয়ায় চমকপ্রদ দিন

'প্রফেসর বরিস সম্পর্কে তুমি কি জানো?' রাকৌস্কি স্ট্রিটের বিখ্যাত চাইকা কাফের বাইরে ফুটপাতের ওপর সাজানো ফাইবার গ্লাসের চেয়ার টেবিলে বসে কফি খেতে খেতে জানতে চাইলো নীল।

রবিন যতটুকু জানতো পুরোটাই নীলকে বললো। রোমের পালাতিনোতে প্রফেসরের রহস্যময় আচরণের কথাও বললো। সব শুনে নীল বললো, 'কী মনে হয় তোমার?'

'আজকের আগে তেমন কিছু ভাবি নি। পালাতিনোতেও প্রফেসরের সঙ্গে অন্য লোক ছিলো। তবে আজকের ঘটনা একেবারে অন্যরকম। মনে হয় সোফিয়া এসে প্রফেসর বিপদে পড়েছেন। অথচ আমি সোফিয়া আসছি জেনে তিনি একবারও বলেন নি যে এখানে আসবেন। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে মনে হচ্ছে।'

'আমার কাছে বেশি গোলমেলে মনে হচ্ছে না। প্রফেসর তোমাকে বলেছেন লণ্ডনে থাকেন। থাকতে পারেন, তবে অরিজিনালি তিনি বুলগেরিয়ান। সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছেন এখান থেকে। আমার মনে হচ্ছে এখানকার সরকার বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে। এ আন্দোলনে অনেক প্রফেসরও আছেন। হয়তো তারাই প্রফেসর বরিসকে আসতে বলেছেন হতে পারে এমন কিছু তিনি জানেন— আন্দোলন যারা করছেন তাদের কাজে লাগবে, ঝিভকভের জন্য যা বিপদজনক হবে।'

নীলের কথা শুনে চমৎকৃত হলো রবিন। প্রফেসর বরিসও নীলকে বুদ্ধিমান বলেছেন। ও যে এতটা গভীর ভাবে ভাবতে পারে রবিন কল্পনা করে নি। বললো, 'দারুণ বলেছিস তুই! আমি তোর মত এতটা ভাবি নি।'

নীল লাজুক হাসলো— 'এটা শুধু আমার ধারণা। ঘটনা অন্যরকমও হতে পারে। প্রফেসর কোন ক্রিমিনাল গ্রুপের সঙ্গেও জড়িত হতে পারেন। আজকাল প্রচুর পুরোনো জিনিস এখান থেকে বাইরে পাচার হচ্ছে। এখানকার অনেক গীর্জায় এক দেড় হাজার বছরের পুরোনো সব আইকন আছে। চুরিও হচ্ছে প্রচুর। গতত মাসে একটা গ্যাং ধরা পড়েছে নকল আইকন বানিয়ে পুরোনো বলে বিক্রি করতে গিয়েছিলো। এসব বুলগেরিয়ান ভাষার প্রফেসররা আসেন কোনটা আসল সেটা বাছাই করার জন্য।'

রবিনের কপালে ভাঁজ পড়লো— 'নাহ্ তোর এ ব্যাখ্যাও ফেলে দেয়ার মত নয়।'

এই বলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভাবলো। তারপর বললো, 'প্রফেসর যদি স্মাগলার হন, তোর ধমকে সিক্রেট পুলিশের তো এভাবে ছেড়ে দেয়ার কথা নয়!'

'হয়তো সন্দেহ করে ধরেছে, হাতে কোন প্রমাণ নেই, জেরা করতে চাইছে।'

রবিন হাল ছেড়ে দিলো— 'নারে, তোর মতো মাথা খাটাতে পারছি না। মনে হচ্ছে তোর দুটো ব্যাখ্যাই ঠিক। নীল হেসে বললো, 'দুটো একসঙ্গে ঠিক হতে পারে না। জানতে হবে কোনটা ঠিক।'

'কাল রাতেই জানতে পারবি।'

আমেরিকান এম্ব্যাসিতে নামার আগে প্রফেসর বলেছিলেন, কাল সাতটায় ওঁর সঙ্গে ওরা যেন ডিনার করে।

কফি শেষ করে নীল বললো, 'এখন কোথায় যাবে বলো। এগারোটা বাজে। আরও দু'ঘন্টা ঘুরতে পারি।'

নীলকে কফির বিল দিতে দেখে রবিন বললো, 'কোথাও যাওয়ার আগে কিছু ডলার ভাঙাতে চাই। কাছে কোথায় মানি এক্সচেঞ্জ আছে সেখানে চল।'

'মানি এক্সচেঞ্জে এক ডলার ভাঙালে পুরো এক লেভাও পাবে না। তোবারককে দিও। ওর কিছু ভিয়েতনামী বন্ধু আছে। ওরা ডলারের ব্যবসা করে। এক ডলারের বদলে তোমাকে সাত আট লেভা দেবে।'

'বলিস কি! এ যে চোরাকারবারি। ভিয়েতনামীরা এসব নোংরা কাজ করে?' একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের এ ধরণের আচরণের কথা জেনে আহত বোধ করলো রবিন।

'কাজটা বেআইনি হলেও ভিয়েতনামীরা খুবই ভালো মানুষ। ওরা প্রতিটি ডলার ওদের দেশে পাঠায়। বুলগেরিয়ান গভমেন্টও এটা জানে।'

'তাহলে চল, এম্ব্যাসিতে গিয়ে তোবারককে ধরি।'

'অফিস টাইমে তোবারককে এসব কাজে পাবে না। এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আজ আমার কাছ থেকে ধারই না হয় নাও। বুঝতে পেরেছি, ছোট বলে আমাকে খরচ করতে দেখে তোমার ইগোতে লাগছে।'

রবিন হেসে বললো, 'নারে নীল। তোকে আমি সব সময় আমার বন্ধুর মত ভাবি, কখনো ছোট ভাবি না। অনেক জিনিস তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস।'

রবিনের কথা শুনে নীলের বুকটা ফুলে উঠলো। ওর কল্পনার নায়ক যদি ওকে বন্ধু ভাবে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। লাজুক হেসে বললো, চলো, তোমাকে এদের রেভল্যুশনের মিউজিয়ামটা দেখাই।'

'এখান থেকে কত দূরে?'

'বুলেভার্ড রুসকি, বেশি দূর নয়, হেঁটে যাওয়া যাবে।'

হাঁটতে রবিনের ভালো লাগে। তবে রাকৌস্কি স্ট্রিটের পাথর বাঁধানো মসৃণ রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে দু'বার হোঁচট খেলো। আক্ষরিক অর্থে নয়, চমকানোর মতো দৃশ্য দেখে। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর রাস্তার ধারে এক জীর্ণ পোষাকের মহিলাকে দেখলো ভিক্ষে করতে। রবিনের চেহারা দেখে মহিলা ভাবলো ধনী কোনও পর্যটক, কাছে এসে হাত

পেতে বললো, 'ওয়ান ডলার প্লিজ।' তারপর ইশারায় দেখালো খিদে পেয়েছে।

কোন কথা না বলে রবিন এক ডলারের নোট পকেট থেকে বের করে মহিলাকে দিলো। ডলার পেয়ে মহিলার বিষণ্ন চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাথা ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিলো।

রবিন দুঃখভরা গলায় বললো, ধনীদের শহর রোমেও ভিখিরি দেখে আমি এত চমকাই নি। সোফিয়াতে মানুষ কেন ভিক্ষে করে?'

নীল বললো, 'এ মহিলা সোফিয়ার নয়, জিপসী, বাইরে থেকে এসেছে। তবে বাবা বলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কথা ছবিতে দেখে বইয়ে পড়ে যত সুন্দর মনে হয়, কাছে থেকে দেখলে, এদেশে থাকতে গেলে তত সুন্দর মনে হয় না।'

রবিন কোনও কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে লাগলো। কিছুদূর যাওয়ার পর এক গির্জার সিড়িতে আরো একজন ভিখিরি দেখলো। বুড়ো, পরনের কাপড় তালিমারা, পায়ে শতচ্ছিন্ন জুতো। নীল বললো, 'যতই বলো, আমাদের দেশের মত কোন দেশেই রাস্তায় ভিখিরি গিসগিস করে না।'

দেশের কথা মনে হতে রবিনের খারাপ লাগলো। নীলের কথার কোন জবাব দিলো না।

বুলগেরিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের জাদুঘর দেখতে গিয়ে রবিন কখনো উদ্দীপ্ত হলো, কখনো হতাশ হলো নিজেদের কথা ভেবে। নীলকে দুঃখ করে বললো, 'এখনো মুক্তিযুদ্ধের একটা জাদুঘরও আমরা বানাতে পারি নি। আমাদের বয়সী বহু ছেলেই জানে না একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধটা আসলে কী ছিলো।'

নীল বললো, 'বাবা প্রায়ই দুঃখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা আমাদের শত্রু ছিলো, যারা লাখ লাখ মানুষ মেরেছে, তারাই নাকি এখন সব বড় বড় নেতা হয়ে বসেছে।'

'আমার কি মনে হয় জানিস? একাত্তরের চেয়ে অনেক বড় একটা মুক্তিযুদ্ধ এখনো আমাদের করা বাকি রয়েছে।'

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে ওরা বাসে চেপে বাড়ি ফিরে এলো। একটু পরে বাবাও খেতে এলেন। খাবার টেবিলে নীল বললো, 'বাবা, এখানকার পার্টির কারো সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

'আলাপ তো অনেকের সঙ্গে আছে।' বাবা জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'রবিনদা এখানকার অবস্থা বুঝতে চান। ওকে পার্টির কারো সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দাও।'

'দেয়া যাবে। তবে পার্টির কারো সঙ্গে কথা বললেই যে রবিন সবকিছু বুঝবে তা তো মনে হয় না।'

'অন্যদের সঙ্গে আমি আলাপ করিয়ে দেবো।'

খাওয়ার পর ছেলেদের ন্যাশনাল গ্যালারিতে নামিয়ে দিয়ে নীলের বাবা সোজা দূতাবাসে গেলেন। নিজের কামরায় বসে নীলের কথা ভাবছিলেন। যতটা স্বাধীনতা দেয়ার সবটুকুই তিনি ওকে দিয়েছেন। আমেরিকান স্কুলে পড়েও অন্য সব

কূটনীতিকদের ছেলের মত হয় নি। ছুটির দিনে অন্য ছেলেরা যখন সুইমিং কিম্বা রাইডিং-এ যায়, নীল সময় কাটায় লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে। স্কুলে কিছুটা খেলাধূলা করে বটে, তবু সেদিকে তেমন কোনও ঝোঁক নেই। এখন আবার বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সিভিক মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়েছে। ফরেন অফিস টের পেলে মোটেই খুশি হবে না। তবু নীলকে তিনি কথা দিয়েছেন ওদের সঙ্গে আলাপ করবেন।

ঠিক চারটায় ইন্টারকমে ইলিনা মিরকোভা বললো, 'স্যার, আমি কি কিছুক্ষণের জন্য আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'চারটায় একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'এই এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারেই আলাপ করবো।'

'ঠিক আছে, কফি নিয়ে চলে এসো।'

পাঁচ মিনিট পর ট্রেতে করে দু' কাপ কফি নিয়ে নীলের বাবার ঘরে ঢুকলো ইলিনা। কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বিব্রত গলায় বললো, স্যার, আমিই সেই ব্যবসায়ী।'

'তার মানে?'

'একজন ব্যবসায়ী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলো। আপনি আজ বিকেলে তাকে সময় দিয়েছেন।'

'তুমি কেন সেই ব্যবসায়ী হতে যাবে?'

'আমি ব্যবসায়ী নই। সিভিক মুভমেন্টের একজন। আপনি বলেছিলেন ব্যবসায়ীর পরিচয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'তুমি কিভাবে জানলে?'

'আপনার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে পাঠিয়েছেন লিলিয়া গিয়র্গিয়েভা। নীলের বন্ধু রিস্টোর মা।'

'তাই বলো।' হাঁপ ছাড়লেন রাষ্ট্রদূত। বললেন, 'আমি সন্দেহ করতাম তোমাদের কেউ বুঝি ঝিভকভের গুপ্ত পুলিশের গোয়েন্দা। এখানে যে সিভিক মুভমেন্টের কেউ থাকবে কখনো ভাবি নি।'

'গোয়েন্দা বিভাগের লোকও আছে। রিসেপশনিস্ট সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। বেশির ভাগ দূতাবাসের রিসেপশনিস্টরাই গোয়েন্দা বিভাগের। কারা যাওয়া আসা করে তার হিসেব রাখে।'

'ওকে আগামী মাসেই বিদায় করবো।'

ইলিনা মৃদু হেসে বললো, 'জানার পর বিদায় করাই উচিৎ। তবে নতুন যে আসবে— সেও যে একই পদের হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

'পরে দেখা যাবে। এখন বলো, দেখা করতে চেয়েছিলে কেন? তোমার জানা থাকার কথা আমরা কী করতে পারি।'

'আপনি কি আমাদের ফ্যাক্স মেশিন ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারেন?'

'অফিসিয়ালি অবশ্যই না। কেউ যদি লুকিয়ে ব্যবহার করে সেটা আমি জানবো কি ভাবে?'

'বুঝেছি'। ম্লান হেসে ইলিনা বললো, 'মাঝে মাঝে দেরিতে বাড়ি ফিরি। আমি

যতক্ষণ অফিস ছেড়ে না যাই ততক্ষণ রিসেপশনিস্ট বসে থাকে।'

'তাহলে তো এখানে তোমার পক্ষে কাজ করা খুবই বিপদজনক। তুমি আমেরিকান এম্ব্যাসিতে কাউন্সিলার উইলিয়ামের সঙ্গে কথা বলো। ও তোমাকে ফ্যাক্স, টেলিফোন সবই ব্যবহার করতে দেবে।'

'তিনি যে দেবেন— আপনি কি ঠিক জানেন?'

'না জানলে তোমাকে বলবো কেন?'

'আমি কি তাঁকে আপনার নাম বলবো?'

'না। একজন কূটনীতিক হিসেবে আমি ওকে তোমাদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। সেটা আমার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না।'

'আমি দুঃখিত।'

'তোমাকে আমি একটা ব্যাপারে অনুরোধ করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। বলুন কি করতে পারি?'

'রিস্টোর মাকে বলবে, নীলকে যেন এসব কাজে না জড়ায়। আমার ছেলে হিসেবে কিম্বা একজন বিদেশী হিসেবেও এসব কাজে নীলের জড়ানো উচিত নয়।'

'ঠিক আছে বলবো। তবে নীল শুনলে নিশ্চয় মনক্ষুণ্ন হবে।'

'হয়তো হবে। ওকে যা বলার আমিই বুঝিয়ে বলবো। তোমরা দয়া করে ওকে এড়িয়ে যেও, বিশেষ কোনও দায়িত্ব দিও না।'

'লিলিয়া গিয়র্গিয়েভাকে আপনার কথা বলবো।'

'ধন্যবাদ ইলিনা।'

নীলের বাবার জানার ইচ্ছা ছিলো সিটিযেন কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে। ইলিনাকে আগ্রহ দেখালেন না, পাছে ও কোন বিশেষ ধরনের সুবিধা চেয়ে বসে।

গ্যালারি দেখা শেষ করে রবিনকে নিয়ে নীল বেরিয়েছিলো শহরে ঘুরে বেড়াতে। রবিনের ভালো লাগলো সারা শহরে ছড়িয়ে থাকা ছোট বড় নানা ধরনের পার্কগুলো। মজা পেলো সিক্সথ সেপ্টেম্বর পার্কে ছবি আঁকিয়েদের বাজারে। নানা বয়সী শিল্পী নিজেদের শিল্পকর্ম সাজিয়ে বসেছে বিক্রির জন্য। বেশির ভাগ শিল্পীই তরুণ, তাপ্পিমারা জিন্‌স-এর প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা, রাগী প্রতিবাদী চেহারা, তরুণীও আছে কয়েকজন। ছবির দাম খুবই সস্তা কিন্তু ক্রেতা নেই তেমন। দু'একটা যা কিনছে বিদেশী পর্যটকরা। একজন মাঝবয়সী মহিলার চারপাশে ভিড় জমেছে। পোর্ট্রেট আঁকছেন তিনি, মাথা পিছু দশ লেভা। ডলারের আনঅফিসিয়াল রেট-এ চল্লিশ টাকার মত। দেড়শ' দুশ' লেভায় বিক্রি হচ্ছে চমৎকার সব তেল রঙের ছবি। ওর কাছে মজা লাগছিলো পোর্টেট আঁকিয়ে মহিলাকে। কি দ্রুতই না আঁকতে পারেন। প্রথমে পেন্সিলে ড্রইংটা বের করে নিয়ে রঙ চাপাচ্ছেন। অয়েল প্যাস্টেলেই বেশি আঁকছেন, অনুরোধ করলে ওয়াটার কালারও আঁকছেন।

রবিন যখন তন্ময় হয়ে পোর্ট্রেট আঁকা দেখছিলো তখন অল্প দূরে নীলের সঙ্গে বলছিলেন এক বুড়ো।

নীল খুব অবাক হয়ে গেলো যখন অচেনা বুড়ো যেচে এসে নিচু গলায় ওকে

বললেন, 'তোমার সঙ্গে দু মিনিট কথা বলতে চাই। লাইম গাছের নিচে এসো।'

'এক মিনিট।' বলে নীল রবিনের কাছে এসে বললো, 'তুমি এখানে থাকো। আমি একটু টয়লেট সেরে আসি।'

রবিন সায় জানাতেই ও বুড়োকে এসে বললো, 'চলুন।'

খানিকটা ঘাসজমি পেরিয়ে পুরোনো একটা লাইম গাছ, লোকজন কেউ নেই সেখানে। নীল কিছুটা অবাক হয়ে বুড়োর সঙ্গে হাঁটলো, দু' বার পেছনে তাকিয়ে রবিনকে দেখলো।

গাছের নিচে রুমাল পেতে বসলেন বুড়ো। নীলকেও বসতে হলো তাঁর পাশে, রবিনের দিকে চোখ রেখে বুড়ো বললেন, ' তোমাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছি দুটো কথা বলবো বলে। আমার নাম ইভান ইভানভ, রিস্টোর দাদু হই আমি। ওর মা লিলিয়া আমার ভাইঝি।'

নীল বুড়োর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললো, 'আপনার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে আনন্দিত হলাম ইভান ইভানভ। আপনি কি রিস্টোর কোনও খবর এনেছেন?'

'ঠিক ধরেছো বাছা।' মুচকি হাসলেন রিস্টোর দাদু। 'রিস্টো তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'কখন, কোথায়?' ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলো নীল।

'কাল সকালে যেতে পারো। বয়ানায় আমার এক ভাইপো আছে, রিস্টোর মামা হয়, ওর বাড়িতেই আছে।' এই বলে বুড়ো ইভানভ ওর হাতে ছোট্ট একটা চিরকুট গুঁজে দিলেন— 'রিস্টো চিঠি দিয়েছে তোমাকে, পকেটে রেখে দাও। বাড়িতে গিয়ে পড়বে। কথাটা গোপন রেখো। যাবে খুব সাবধানে। পেছনে যেন ফেউ না লাগে।'

'ঠিক আছে।' দু' পাশে মাথা নেড়ে সায় জানালো নীল। তখনই নজর পড়লো রবিনের ওপর— ওকে খুঁজছে। উঠে দাঁড়িয়ে নীল বললো, 'আমার ভাই খুঁজছে আমাকে। রিস্টোকে বলবেন কাল নিশ্চয়ই যাবো।'

বুড়ো মৃদু হেসে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাছা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

নীল কাছে আসতেই রবিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'কী দারুণ পোর্ট্রেট আঁকে, দেখেছিস?'

নীল হেসে বললো, 'তোমার একটা আঁকাবে নাকি। যে রকম হিরোর মত চেহারা তোমার, দেখ না পাঁচ লেভাতেই এঁকে দেবে।'

'ধ্যাত, কি যে বলিস!'

'তুমি তো রীনের ঘরে যাও নি। ওর একটা সুন্দর পোর্ট্রেট এঁকে দিয়েছেন এই মহিলা। ঠাট্টা নয় রবিনদা, ইচ্ছে করলে তোমার একখানা করিয়ে নাও।'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রবিন বললো, 'আরে না আমি পোর্টেট আঁকিয়ে কি করবো?'

'কেন, তোমার বান্ধবীকে উপহার দেবে!'

'দেবো এক থাপ্পড়, বেআদব ছেলে। বড়দের সঙ্গে বুঝি এভাবে কথা বলে!' হাসি চেপে গম্ভীর হওয়ার ভান করলো রবিন।

নীল নিরীহ গলায় বললো, 'বারে আজই তো তুমি বললে, আমাকে ছোট ভাবো না,

সব সময় বন্ধুর মতো ভাবো।'

রবিন এবার হেসে ফেললো— 'ঠিক আছে, বন্ধু। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি ঢাকায় আমার অন্তত এক ডজন বান্ধবী আছে। তাদের সবার জন্য পোর্ট্রেটের পেছনে একশ বিশ লেভা খরচ করতে আমি রাজী নই।'

'তা কেন করবে।' আগের মতো নিরীহ গলায় নীল বললো, 'আসল বান্ধবীকে অরিজিনালটা দিও, বাকিদের ফটোকপি করে দিও।'

নীলের কথার ধরন দেখে হাসতে গিয়ে বিষম খেলো রবিন— 'কে যে আসল আমি নিজেই জানি না।'

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীল বললো, 'তাহলে থাক।'

পার্কের এক কোণে কফি কর্ণার। লাইন দিয়ে কফি কিনতে হয়। নীল লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট পর দুটো কাগজের গ্লাসে কফি আনলো। লাল উইলো গাছের নিচে বসে দু'জনে আরাম করে কফি খেলো। তারপর অনেকটা পথ হেঁটে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলো। তোবারক বাইরের গেট-এর পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলো। নীল বললো, 'বাবা এসে গেছেন।'

ওরা কাছে আসতেই তোবারক হাত পেছনে নিয়ে সিগারেট লুকিয়ে বিব্রত হেসে বললো, 'রবিন তাই বুঝি শহরে বেড়াতে গেছিলেন?'

রবিন হেসে সায় জানালো। নীল বললো, 'রবিনদা আমার বন্ধু। ওর সামনে তুমি সিগারেট খেতে পারো তোবারক ভাই।'

রবিনও ব্যস্ত হয়ে বললো, 'আপনিও আমাকে বন্ধু ভাবতে পারেন। সিগারেট খাবেন এতে লজ্জার কি আছে!'

তোবারক লাজুক হেসে পেছনে লুকানো হাত সামনে আনলো— 'স্যারে ফছন্দ করে না, সেই জন্য লুকাই খাই।' এই বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রবিনকে অফার করলো— 'বুলগেরিয়ান সিগারেট, টেস্ট করি দেখতে ফারেন।'

রবিন প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বললো, 'আমার অভ্যাস নেই, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে এক আধটু টানি।'

তোবারক লাইটার বের করে রবিনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলো। রবিনকে প্রথম সিগারেট টানতে দেখলো নীল। এক টান দিয়েই কেশে ফেললো রবিন। তোবারক অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'এদেশী সিগারেট একটু বেশি কড়া।'

রবিন আরেকবার টেনে ওটা তোবারককে দিয়ে দিলো— 'তুমিই খাও তোবারক। এত কড়া আমার পোষাবে না।'

নীল তোবারককে জিজ্ঞেস করলো— 'তুমি কি কোথাও বেরুবে?'

'না, কোনও কাজ আছে?'

'আমরা ব্যাডমিন্টন খেলবো। কোর্ট রেডি করো।'

একগাল হেসে তোবারক বললো, 'ঠিক আছে নীল বাই।'

চায়ের টেবিলে বাবা রবিনকে বললেন, 'কাল সাড়ে নটায় তোর এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে পার্টির একজন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বারের সঙ্গে। বারোটায় আমি এদের একটা

কেমিক্যাল প্ল্যান্ট দেখতে যাবো। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস।'

'নিশ্চয়ই যাবো।' রবিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'নীল যাবি তো?'

নীল একটু হেসে বললো, 'না রবিনদা। পলিটিক্স-এর কচকচানি আমার ভালো লাগে না। সকালে আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবো।'

চা শেষ করে রবিন ওপরে গেলো কাপড় বদলাতে। নীলের ব্যাডমিন্টন খেলার আইডিয়াটা ওর পছন্দ হয়েছে। রীনও চলে গেলো ওর ঘরে। মা বললেন, 'রবিনের জন্য আজ ফুলকপির রোস্ট করবো। পোলিশ এ্যাম্বাসাডরের গিন্নির কাছে সেদিন শিখেছি।'

নীল নিরীহ গলায় জানতে চাইলো, 'খাওয়া যাবে তো মা।'

মা হেসে বললেন, 'তোকে কে সেধেছে খেতে?'

বাবা নীলকে বললেন, 'তোর মা মাঝে মাঝে আমাদের গিনিপিগ বানাতে পছন্দ করেন।'

'আমার তো আর কাজ নেই!' বলে হাসতে হাসতে মা রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

বাবা নীলকে একা পেয়ে বললেন, 'তোর বন্ধুর মা আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য কাকে পাঠিয়েছে বলতো?'

'আমি কী করে জানবো?' অবাক হয়ে বললো নীল।

'অনুমান করতে পারিস?'

'রিস্টোর বাবাকে? না, না, ওর ওপর তো হুলিয়া—' নীল ভেবে পেলো না কে হতে পারে।

বাবা থেমে থেমে বললেন, 'আমাদের অফিসের ইলিনা মিরকোভাকে।'

'বলো কি বাবা!'

'হ্যাঁ, তাই। আমিও খুব অবাক হয়েছিলাম। পরে রিস্টোর মার নাম বললো—তবেই না বিশ্বাস করলাম।

'ঠিকই আছে বাবা। সেদিন ওকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। বললো সিটিযেন কমিটির সাপোর্টার। ও এত এ্যাকটিভ ওয়ার্কার তখন বুঝি নি। কী বললো তোমাকে?'

ইলিনার সঙ্গে সাহায্যের বিষয়ে যেসব কথা হয়েছে সবই নীলকে বললেন ওর বাবা। শুধু নীলের ব্যাপারে যে কথা হয়েছে সেটা বললেন না। ভাবলেন, পরে এক সময় বুঝিয়ে বলবেন।

ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য তৈরি হয়ে নিচে নামলো রবিন আর রীন। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। ব্যাডমিন্টন কোর্টে আলো জ্বালিয়ে নেট ঝুলিয়ে তোবারক তৈরি। নীল—তোবারক আর রবিন-রীন পার্টনার হয়ে তিন গেম খেললো। প্রথম দুটো জিতলো নীলরা, পরেরটা রবিনরা। তিন গেম খেলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো রবিন।

সবাই মিলে চেস্টনাট গাছের নিচে পাথরের বেঞ্চে বসলো। তোবারক দারুণ হাসাতে পারে। বুলগেরিয়ান জোক বলে রবিনের পেটে খিল ধরিয়ে দিলো। জোক শুনে নীল আর রীনও হাসলো, যদিও অনেকগুলো ওদের জানা ছিলো।

রাত হওয়ার পর সবাই মিলে রিডিং রুমে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলো। তোবারকের সেদিনও বাড়ি যাওয়া হয় নি। ওকে থাকতে না বললে কখনো থাকে না।

তবে এখানে থাকাটা বলা বাহুল্য খুবই আনন্দের ব্যাপার। বিশেষ করে বেগম সাহেবের রান্না একদিন খেলে সাতদিন জিভে স্বাদ লেগে থাকে। নইলে বাড়ি গিয়ে তো জোটে কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত আর বাঁধা কপি দিয়ে মাংশ রান্না। ডেসপাচ ক্লার্ক নইমউদ্দিনের প্রায় অসুস্থ থাকা গিন্নি একপদের বেশি দু'পদ কখনো রাঁধে না।

ঢাকা থেকে রবিন যে সব উপহার এনেছে কাল বের করে নি। খাওয়ার পর এক ফাঁকে উঠে গিয়ে সেগুলো স্যুটকেস থেকে বের করে আনলো। উপহার পেয়ে সবাই দারুণ খুশি। নীলের মার জন্য এনেছে জামদানি শাড়ি, বাবার জন্য এনেছে গরদের পাঞ্জাবী, নীলের জন্য জিনস্-এর প্যান্ট আর শার্ট, ও আগেই চিঠিতে লিখেছিলো পাঠাতে। রীনের জন্য সালোয়ার কামিজ, সঙ্গে রোম থেকে আনা স্যুভেনির। এ ছাড়া মুসুরির ডাল এনেছে দু'কেজি আর চানাচুর এক কেজি। নীলের মা দামী জামদানি শাড়ির চেয়ে বেশি খুশি হলেন ডাল আর চানাচুর পেয়ে। বললেন, 'ভাইয়ার কাণ্ড দেখ। কবে বলেছিলাম এখানে ডাল পাওয়া যায় না, মনে করে ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

রীন বললো, 'তোমার জামদানি শাড়িটা কী চমৎকার হয়েছে মা! বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে তুমি এটাই পরবে। রবিনদা তুমি কিন্তু আমাদের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান দেখে যাবে।'

রবিন আঁতকে উঠলো— 'পাগল হয়েছিস! বাবা শুনলে হার্টফেল করবেন।'

মা বললেন, 'কী ভালোই না হতো ভাইয়াও যদি আসতেন।'

রবিন ওর বাবাকে আনার জন্য রোম থেকে সোফিয়া আসার পথে মনে মনে একটা প্ল্যান এঁটেছিলো। সে কথা এখন আর কাউকে বললো না।

রিন্টো আর নীলের বিপদ

পরদিন বেলা দশটার দিকে বয়ানা এসে বাস থেকে নামলো নীল। রিন্টোর দাদু ইভান ইভানভের কথা মত সারাটা পথ সতর্ক ছিলো। বাস থেকে নেমে গ্রামের পথে যেতে যেতে কয়েকবার লক্ষ্য করলো— না, কেউ অনুসরণ করে নি। মাকে বলে এসেছে রিন্টোদের গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে, ফিরতে সন্ধ্যা হবে। রবিনেরও আজ সারাদিনই প্রোগ্রাম। নীল ঠিক করেছে রিন্টোর সঙ্গে আজ লম্বা সময় কাটাবে।

হেমন্তের এই সময়টায় প্রায় প্রতি বছরই ঝড় বৃষ্টি হয়। বলকানের বুড়োরা বলে শীতবৃষ্টি। বৃষ্টির পরই হাড় ফুটো করা শীত নামে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বরফ পড়া

শুরু হয়, শীতের হু হু বাতাস তখন থাকে না। প্রথমে আল্পস-এর মাথায় বরফ জমে, তারপর নীচে নামতে থাকে। এক রাতে তুষার ঝড়ের পর সব কিছু সাদা তুলোর মত বরফে ঢাকা পড়ে যায়। এ সময়টা নীলদের খুব ভালো লাগে। বুড়োরা বলে তুষার না পড়লে বড়দিনের পুরো আনন্দই মাটি।

রিস্টো বলেছিলো জাদুঘরের পাশে যে কফিশপ আছে সেখানকার বুড়ো ওয়েটার আন্তনকে বললে ও জায়গামত পৌঁছে দেবে। নীল গিয়ে দেখলো আন্তন ওরই জন্যে অপেক্ষা করছে। নীল কাছে যেতেই একগাল হেসে আন্তন বুড়ো বললেন, 'তুমি তাহলে আমাদের রিস্টোর বন্ধু! ঠিক চিনেছি কিনা বলো তো বাছা নীল।'

নীল হেসে বললো, 'আমার নামও জানেন দেখছি আন্তন আন্তনভ!'

খল খল করে হেসে বুড়ো বললেন, 'তুমি আমার নাম জানবে, আমি তোমার নাম জানবো না, তা কি কখনো হয়! এখন আর কফি খেতে বলবো না, এমনিতে দেরি হয়ে গেছে। রিস্টো বলেছিলো নটা সাড়ে নটার মধ্যে এসে পড়বে।' এই বলে উঠে দাঁড়ালেন আন্তন আন্তনভ।

বুড়োর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নীল বললো, 'বাসের জন্য দেরি হয়েছে। পথে চেকপোষ্ট বসিয়েছে। সব বুলগেরিয়ানদের জেরা করছে, ব্যাগ, সুটকেস খুলে দেখছে।'

'যত সব নোংরা শয়তানের দল। বেশি আর চোটপাট করতে হবে না। দিন ঘনিয়ে এসেছে।' গজ গজ করতে করতে বললেন বুড়ো।

রিস্টোর মামাবাড়ি পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগলো। সারাটা পথ আন্তন আপন মনে প্রেসিডেন্ট ঝিভকভকে গাল দিতে দিতে এসেছেন। মাঝখানে বুড়ো বোধহয় দম নেয়ার জন্য থেমেছিলেন— সেই ফাঁকে নীল শুধু বলেছিলো, 'ঝিভকভ কি আপনাদের ভালোর জন্য কিছুই করে নি?' ব্যস তারপর যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটলো— 'শহরে বড়লোকদের ভেতর থাকো তো, দেশের খবর কিছু জানো না— '

নীলের অত খবরের দরকারও ছিলো না। জায়গা মত এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রিস্টো দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো নীলের অপেক্ষায়। দেখা হতেই ছুটে এসে দুই বন্ধু কোলাকুলি করলো। রিস্টো অবশ্য বলকানিদের কায়দায় নীলের গালে চুমোও খেলো, যা এখনো রপ্ত করতে পারে নি নীল।

আন্তন বললেন, 'আমার ডিউটি শেষ। চললাম বাছারা, প্রাণভরে গল্প করো।'

নীল বললো, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আন্তন আন্তনভ।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' বলে চলে গেলেন অমায়িক বুড়ো। রিস্টো হেসে বললো, 'কথা একটু বেশি বলে আন্তন দাদু, এমনিতে লোক খুব ভালো।'

'তোর ইভান দাদুও খুব ভালো। দেখা হয়েছে কাল সন্ধ্যায়।'

'দাদু এখানেই আছে। ভেতরে চল, মাও এসেছেন আজ সকালে।'

পুরোনো আমলের ছোট পাথরের বাড়ি রিস্টোর মামাদের। ছোট ছোট জানালা, দেয়ালগুলো সব পাথরের, ছাদে লাল টালির ছাউনি। বাড়ির আঙিনাতেও পাথর বসানো।

ভেতরে যেতেই নীলকে দেখে ছুটে বেরিয়ে এলেন রিস্টোর মা। বললেন, 'আমি খুব

খুশি হয়েছি তুমি এসেছো! পথে আশা করি কেউ তোমাকে লক্ষ্য করে নি?'

'না আন্টি। আমি খুব সতর্ক ছিলাম।' একটু বিব্রত হেসে জবাব দিলো নীল। 'গতবার এরকম সতর্ক থাকলে গোয়েন্দা অনুসরণ করতে পারতো না।'

'তোমরা ভেতরে গিয়ে বস। আমি তোমাদের জন্য কফি বানিয়ে আনছি।' এই বলে রিস্টোর মা রান্নাঘরের দিকে গেলেন। আঙিনার এক পাশে রান্নাঘর। বলকান অঞ্চলের এ ধরনের ঘরবাড়ি নীলের খুব ভালো লাগে। ঘরের ভেতরটা ভারি আরামের। গরমের সময় ঠাণ্ডা আর শীতের সময় গরম থাকে।

দু'টো ঘর পেরিয়ে রিস্টো ওকে ভেতরের এক কামরায় নিয়ে গেলো। একপাশের ছোট জানালা দিয়ে আসা হলদে রোদের টুকরো কাঠের মেঝের ওপর ছোট এক আয়তক্ষেত্র এঁকেছে। আরেক পাশের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের ওপর জাজিম পেতে শোয়া বসার জায়গা করা হয়েছে। জাজিমের ওপর পাতা চাদরে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো বসিয়ে নকশা করা। রিস্টো আর নীল সেই জাজিমে গিয়ে বসলো। ঘরের ভেতরের ভারি কাঠের দরজা জানালা আর পুরোনো দিনের নকশা আঁকা দেখে নীলের মনে হলো এ বাড়ির বয়স একশ বছরের কম হবে না।

রিস্টো বললো, 'শুনেছিস তো কি রকম ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

'শুনেছি।' দু' পাশে মাথা নেড়ে সায় জানালো নীল। 'তবে বাবার কাছে যতটা সাহায্য পাবি ভাবছিস সরাসরি ততটা পাওয়া কঠিন হবে। তোর বাবার খবর কি, কেমন আছেন?'

রিস্টোর মা লিলিয়া গিয়র্গিয়েভা বড় ট্রেতে দু' কাপ কফি আর বাটিতে আলুর পিঠে ভেজে এনেছেন। কালো ফুলতোলা গাউনের উপর সাদা লেস বসানো এ্যাপ্রণ পরা অবস্থায় তাঁকে মনে হচ্ছিলো অতিব্যস্ত এক গৃহিনী। ছোট বাটিতে নীলকে পিঠা তুলে দিয়ে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করে বানিয়েছি, ভালো হয় নি।'

এক কামড় পিঠা মুখে ফেলে নীল বললো, 'আপনার রান্নার প্রশংসা আপনাকে সরাসরি না বললেও মাকে বহুবার বলেছি।'

মৃদু হেসে গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'তোমার মা'র সঙ্গে ফোনে মাঝে মাঝে কথা হয়। তিনি বলেছেন।'

নীল প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'কাল আপনার পাঠানো লোককে দেখে বাবা ভারি অবাক হয়েছেন।'

'তোমার বাবা কিভাবে দেখলেন তাকে?'

'বাবা তো তাঁকে রোজই দেখছেন। অবশ্য আপনাদের লোক হিসেবে কালই প্রথম জানলেন।'

নীলের কথা শুনে লিলিয়া গিয়র্গিয়েভার কপালে ভাঁজ পড়লো— তুমি কার কথা বলছো বাছা?'

'কেন, ইলিনা মিরকোভা! আপনিই তো পাঠিয়েছিলেন তাকে বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্য।'

'ইলিনা মিরকোভা?' ভাঙা গলায় বললেন গিয়র্গিয়েভা— 'সে কে? আমি কেন

তাকে পাঠাবো তোমার বাবার কাছে?'

নীল বুঝলো ভীষণ এক গোলমাল হয়ে গেছে। অবাক হয়ে বললো, 'কাল চারটায় না বাবার সঙ্গে আপনার লোকের দেখা করার কথা ছিলো? আপনাকে আমি টেলিফোনে বলি নি?'

'তা তো বলেছো। আমি পাঠিয়েছিলাম ভাসিল কিরকভকে। ও এসে বললো তোমার বাবার নাকি অন্য কি এক জরুরি প্রোগ্রাম আছে। ভাসিলকে আগামীকাল বিকেলে চারটায় যেতে বলেছেন।'

'কে বলেছে এসব কথা?'

'কে আর বলবে! তোমার বাবার সেক্রেটারি মেয়েটি বলেছে।'

'কী সর্বনাশ!' নীলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো— 'ইলিনা মিরকোভা নিশ্চয়ই গুপ্ত পুলিশের চর হবে। ও বাবাকে বলেছে ওকেই নাকি আপনারা বাবার কাছে পাঠিয়েছেন কথা বলার জন্য।'

'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।' অসহায় গলায় বললেন গিয়র্গিয়েভা— 'দয়া করে খুলে বলো বাছা শয়তান মেয়েটার সঙ্গে তোমার বাবার কি কি কথা হয়েছে।'

বাবা যেভাবে ওকে বলেছিলেন সব কথা গিয়র্গিয়েভাকে বললো নীল। রিস্টো এতক্ষণ চুপচাপ বসে নীল আর ওর মার কথা শুনছিলো। উৎকণ্ঠিত গলায় বললো, 'মা, নীলের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর বাবাকে গুপ্ত পুলিশ বিপদে ফেলতে চাইছে। ওঁকে এক্ষুণি সাবধান করে দেয়া দরকার।'

চিন্তিত গলায় গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'সাবধান নিশ্চয় করা দরকার। তবে নীলের কথা শুনে কিছুটা ভরসাও পাচ্ছি। ওর বাবা খুবই বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছেন। ডাইনি শয়তানটাকে এমন কোন কথা বলেন নি, যাতে করে ওঁর বিপদ হতে পারে। তিনি বুদ্ধি করে ওকে কাটিয়ে দিয়েছেন ওর আসল পরিচয় না জেনেই।'

'কিন্তু মা, গুপ্ত পুলিশ জানলো কি করে তোমার লোক চারটায় ওর বাবার সঙ্গে দেখা করবে?'

'নিশ্চয়ই টেলিফোনে আড়ি পেতে শুনেছে।'

নীল বললো, 'আপনি ভালো করে মনে করুন আন্টি, আপনাকে আমি এমন কোনও কথা কি বলেছি, যাতে মনে হতে পারে চারটায় বাবার সঙ্গেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট! পষ্ট মনে আছে আমি বলেছিলাম কাল বিকেল চারটায় একজন ব্যবসায়ী দেখা করতে পারেন। কার সঙ্গে কে দেখা করবে এ কথা থেকে কিছু বোঝা যায় না। আপনি কে সে পরিচয় আপনি টেলিফোনে দেন নি।'

'অনুমান করতে পারে। আমার গলা শুনে হয়তো চিনেছে।'

নীল একটু ইতস্তত করে বললো, 'এমন কি হতে পারে না, আপনাদের নিজেদের ভেতরই গুপ্ত পুলিশের কোন চর আছে? আপনি কিছু মনে করবেন না আন্টি, আমি শুধু আমার সন্দেহের কথা বলছি।'

শুকনো গলায় গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা সবাই দীর্ঘ দিনের পরিচিত। আমাদের ভেতর শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা আসবে কী ভাবে?'

'অসম্ভব নয় মা।' বলে রিস্টো মাকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো— সম্ভবত নীলের কথা ভেবে বললো না।

তোবারকের কথা মনে পড়লো নীলের। তোবারক বলেছিলো ইলিনা নাকি প্রায় খোঁজ খবর নেয় ওর বাবার কাছে কারা আসে। তখনই নীলের সন্দেহ হয়েছিলো ইলিনা গুপ্তচর নয়তো! বাবাকে বলতে গিয়েও বলে নি, পাছে তিনি ছেলেমানুষি ভাবেন।

প্রফেসর বরিসের কথা মনে পড়লো নীলের। গিয়র্গিয়েভাকে বললো, 'আপনি কি প্রফেসর বরিসকে চেনেন?'

'কে প্রফেসর বরিস?'

'লণ্ডনে বাড়ি। রোম থেকে সোফিয়া এসেছেন। কাল সকালে ভিতুশা পাহাড়ে দেখা হয়েছিলো। মনে হলো গোয়েন্দা পুলিশের পাল্লায় পড়েছেন। আমার ভাই রবিন আর আমি ওঁকে উদ্ধার করে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছি।'

নীলের কথা শুনে গিয়র্গিয়েভা অবাক হলেন প্রথমে। তারপর হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি আমার মামার কথা বলছো। তিন দিন হলো তিনি সোফিয়া এসেছেন। আমরাই তাঁকে আসতে বলেছিলাম। কাল রাতে ফোনে বললেন, সকালে ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন, দুটো বিদেশী ছেলের কারণে প্রাণে বেঁচে গেছেন। তোমরাই তাহলে সেই বিদেশী ছেলে?'

'ওঁকে ওরা ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। আপনি তো ভালোভাবেই জানেন গুপ্ত পুলিশ যাদের একবার নেয় তারা আর ফেরে না। তিনি কি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত?'

'তোমরা যা করেছো এর জন্য কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। মামা ছিলেন ঝিভকভের সামরিক উপদেষ্টা। পনেরো বছর আগে প্যারিস গিয়েছিলেন এক ডেলিগেশনের সঙ্গে। সেখান থেকে আর দেশে ফেরেন নি। পরে আমেরিকায় চলে যান, নাসায় এখন বড় চাকরি করেন। সিটিযেন কমিটি খবর দিয়ে এনেছে তাঁকে।'

'আজ সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।'

রিস্টো বললো, 'দাদুকে তুই প্রফেসর বরিস বলছিস কেন, ওঁর নাম তো দিমিত্রি ইয়াভরভ।'

'আমি কী ভাবে জানবো!' নিরীহ গলায় বললো নীল, 'আমার ভাইকে তিনি যে নাম বলেছিলেন আমি তাই বললাম।'

গিয়র্গিয়েভা হেসে নীলের চিবুক ধরে আদর করে বললেন, 'তুমি কিছু মনে করো না। এরকমই বলা নিয়ম। দেখতেই তো পাচ্ছো, চারপাশে কত বিপদ। কে বন্ধু কে শত্রু চট করে কি বোঝা যায়?'

নীল মৃদু হেসে বললো, 'আমার ভাইর সঙ্গে রোমে আসার পথে প্লেনে এত আলাপ হলো অথচ রোমে দেখা হওয়ার পর তিনি না চেনার ভান করেছেন।'

'তখন কি সঙ্গে অন্য কেউ ছিলো?'

'তা অবশ্য ছিলো। আজ সন্ধ্যায় দেখা হলে ওঁকে কি আপনার কথা বলবো?'

'নিশ্চয়ই বলবে। আমার সঙ্গে কালই ওঁর দেখা হবে।'

'ছেলেদের নিয়ে ভালোই আড্ডা জমিয়েছিস দেখছি লিলিয়া।' বলতে বলতে রিস্টোর দাদু ইভান ইভানভ এসে ঘরে ঢুকলেন। নীলদের পাশে জাজিমে বসে বললেন, 'অনেক পথ হেঁটেছি রে বাছা। জলদি আমাকে বড় এক মগ কফি বানিয়ে দে।'

'এক্ষুণি আনছি,' বলে গিয়র্গিয়েভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রিস্টো বললো, 'নীল আর ওর ভাই কাল কী সাংঘাতিক কাজ করেছে শোনো নি তো দাদু। ভিতুশা পাহাড় থেকে পুলিশ ইয়াভরভ দাদুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। নীল আর ওর ভাই রবিন ওঁকে উদ্ধার করে ট্যাক্সিতে তুলে একেবারে আমেরিকান এম্ব্যাসিতে পৌঁছে দিয়েছে।'

'তোমরাই তাহলে সেই রূপকথার নায়ক।' বলে হা হা করে হাসলেন ইভান ইভানভ— 'আজ সকালেই ফোনে কথা হয়েছে ইয়াভরভের সঙ্গে। বললো, বিশ্বাস করবে না ভায়া, আরেকটু হলে আমার প্রাণপাখিটা বুকের খাঁচা থেকে চিরদিনের জন্য বেরিয়ে যেতো, ঠিক তখনি রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে যেন দুই রাজকুমার উঠে এলো। দৈত্যের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করে রাজপুরিতে পৌঁছে দিলো। টেলিফোনে ঠিক এভাবেই বলেছিলো বেআক্কেলে ইয়াভরভ। টেলিফোনের কথায় অচেনা লোকের সঙ্গে কেউ ওভাবে দেখা করতে যায়?'

'কাকে বেয়াক্কেল বলছো কাকা?' কফির ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন গিয়র্গিয়েভা।

'কে আবার! তোর মামা ইয়াভরভ। চিরটা কালই গর্দভ থেকে গেলো। কী করে যে আমেরিকান ছাগলগুলো ওকে এত বড় চাকরি দিলো— ভেবে অবাক হই।'

'ওঁর কথা বাদ দাও।' গম্ভীর হয়ে গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'ঝিভকভের নোংরা খাওয়া কুকুরগুলো যে নীলের বাবার পেছনে লেগেছে, সে কথা শুনেছো?'

ইলিনা মিরকোভার শয়তানির কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন ইভান ইভানভ। 'ডাইনিটা যদি ওই ভালো মানুষটার কোন ক্ষতি করে, ওকে আমি পুরোনো দিনের মত জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।' নীলকে বললেন, 'তুমি একটুও ভেবো না বাছা। তোমার বাবার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। পুলিশের ভেতর আমাদেরও লোক আছে।'

রিস্টো ওর দাদুকে বললো, 'তুমি তাহলে ওদিকে সামলাবে। ও নিয়ে নীল আর ভাববে না। ওকে আমি আরেকটা কাজ দেবো।'

'কী কাজ?' জানতে চাইলো নীল।

কাষ্ঠ হেসে রিস্টো বললো, 'বলতে খারাপ লাগছে তোকে। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হলেও তুই বিদেশী। তবু ভেবে দেখলাম এ কাজটা তোকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।'

'অত ভনিতা না করে বলেই ফেল না কি কাজ?'

'তোদের ক্লাসে রাশান এ্যাম্বাসাডরের ছেলে নিকোলাই পড়ে। ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কেমন?'

'খারাপ না, ভালোই। ক্লাসের সব ছেলের সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক। নিকোলাই আমার টিমে ফুটবলও খেলে।'

'ওর বাবাকে দেয়ার জন্য একটা প্যাকেট দেবো। নিকোলাইকে বলবি ও যেন কাল বিকেলে ফ্রিডম পার্কে মার্বেল ব্রিজের পাশে অপেক্ষা করে।'

'যদি ও রাজী না হয়?'

রিস্টো কাকুতিভরা গলায় বললো, 'রাজী করানোর দায়িত্ব তোর। যেভাবেই পারিস রাজি করাবি।'

'তোর বিপদের কথা বলতে পারি ওকে?'

'যা খুশি বলিস। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার রাশান এম্ব্যাসি ছাড়া সবার সঙ্গেই যোগাযোগ হয়ে গেছে। রাশান এম্ব্যাসিতে এতো বেশি গুপ্তচর যে আমরা ধারে কাছে যেতে পারছি না।'

নীল বললো, 'ঠিক আছে, নিকোলাইকে বলবো। তোর বিপদের কথা বলেই রাজী করাতে হবে।'

নীলের কথা শেষ না হতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কফিশপের আন্তন আন্তনভ। হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'লিলিয়া গিয়র্গিয়েভা, এই যে ইভান ইভানভও আছেন দেখছি। সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুলিশ গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। এদিকেই আসছে। আপনারা শিগগির পালান এখান থেকে। আমি কিছুক্ষণ সামাল দিতে পারবো।'

ঘরের ভেতর যেন বাজ পড়লো। কয়েক মুহূর্তে কারো মুখে কোন কথা ফুটলো না। অসম্ভব ঘাবড়ে গেছেন লিলিয়া গিয়র্গিয়েভা। এ ধরনের পরিস্থিতির ভেতর তাঁকে আগেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু নীলের কী হবে? ওকে নিয়ে কি পালিয়ে যাবেন? বিদেশী ছেলেটাকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া কি উচিৎ হচ্ছে?

প্রথম কথা বললেন ইভান ইভানভ— 'লিলিয়া, তুই ছেলে দুটোকে নিয়ে এক্ষুণি পাহাড়ের দিকে চলে যা। আমি ভজেনিকাটা হয়ে তোদের কাছে আসবো। তোরা ডেরা ছেড়ে কোথাও যাবি না।'

গিয়র্গিয়েভা বললেন, 'নীলকে সঙ্গে নেয়া উচিৎ হবে না। ও আমাদের সঙ্গে থাকলে ওর বাবার অসুবিধে হবে।'

'মা, আমি এক কাজ করি।' রিস্টো সমস্যার সমাধান করলো— 'নীলকে নিয়ে আমি গ্রামের পেছনের পথ ঘুরে বেরিয়ে যাই। ওকে হাইওয়ে পৌঁছে দিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে ডেরায় দেখা করবো।'

রিস্টোর সমাধান সকলের পছন্দ হলো। গিয়র্গিয়েভা নীলকে বললেন, 'হাইওয়ে থেকে বয়ানার বাস ষ্ট্যাণ্ডে যেতে মাইল দেড়েক হাঁটতে হবে। কিছু মনে কোরো না বাবা। আমাদের সব সময় প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। এমনিতেই তোমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।'

নীল বললো, 'আপনি মিছেমিছি আমার জন্য ভাবছেন আন্টি। আমার কিছুই হবে না। আমি যা করছি—'

রিস্টো বাধা দিয়ে বললো, 'আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই নীল। চল বেরুই।'

দরজার পাশ থেকে ছোট একটা এয়ারব্যাগ কাঁধে তুলে নিলো রিস্টো। নীলের হাত ধরে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

গিয়র্গিয়েভার বুকটা টনটন করে উঠলো। হেসে খেলে এখন দিন কাটাবার বয়স রিস্টোদের। অথচ ওকে এমন বিপদের কাজ করতে হচ্ছে— সরকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়া মানে সব কিছু চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাওয়া। ঝিভকভের হায়নার দল কাউকে একবার ধরলে সে আর জীবিত ফিরে আসে না। বেশি দয়া হলে কখনো কবর দেয়ার জন্য শুধু লাসটা ফেরত দেয়।

গিয়র্গিয়েভা টেরও পান নি কখন যে ওঁর দু'চোখ বেয়ে কান্না গড়িয়ে পড়েছে। ইভানভ বললেন, 'চল বাছা, আর দেরি করিস না। রিস্টো আর নীল দুজনই খুব সাহসী ছেলে। ওদের কিছু হবে না।'

ওঁরা দুজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন আন্তন। তারপর ভেতরে গিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে এমন কিছু ব্যবস্থা করলেন শয়তানের দলের যাতে খুঁজতে কিছু সময় লাগে। এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেলেন— ততক্ষণে ছোঁড়া দুটো নদী পার হয়ে যাবে।

গ্রামের ভেতর পাথুরে পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীল বললো, 'তোকে তো বলা হয় নি রিস্টো, আমার ভাই রবিন তোদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ও দেশে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।'

'সোফিয়ায় কতদিন থাকবে তোর ভাই?'

'বেশি হলে সপ্তাহ খানেক।'

'ঠিক আছে, কখন কোথায় দেখা হবে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো। কাল তোদের বাসার ডাকবাক্সে আমার চিঠি পাবি।'

'আজ সন্ধ্যায় ডিনারে তোর ইয়াভরভ দাদুর সঙ্গে তো দেখা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না?'

'মনে হয় না দাদু বেশি সময় দিতে পারবেন। খেতে খেতে যতক্ষণ পারিস কথা বলিস। তবে ইয়াভরভ দাদু বাইরে ছিলেন। তিনি আর কতটুকুই বা জানেন। বরং ইভানভ দাদু অনেক ভালো বলতে পারবেন।'

পুলিশ যে গ্রাম ঘেরাও করেছে এ খবর গ্রামের সবাই জেনে গেছে। বাড়িঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। পাথুরে রাস্তায় রিস্টো আর নীলের হাঁটার শব্দে উৎসাহী কোনও মহিলা জানালা ফাঁক করে দেখছিলো আর ছেলে দুটোর সাহস দেখে অবাক হচ্ছিলো। মিনিট পনেরো হাঁটার পর নীল জিজ্ঞেস করলো, 'আর কদ্দুর যেতে হবে?'

'দশ মিনিট পর আমরা গ্রাম থেকে বনে ঢুকবো। বার্চ বনের ভেতর একটা গোপন পথ আছে। আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। সেই পথ দিয়ে মাইল খানেক হাঁটলেই হাইওয়েতে গিয়ে পড়বো।'

'তুই আগে কখনো পুলিশের এরকম ঘেরাওর ভেতর পড়েছিস?'

'একবার নয়, কয়েকবার পড়েছিলাম। বিপদ শহরেই বেশি, গ্রামের পথঘাট অনেক ছড়ানো, এলোমেলো। গ্রামে সময় মত খবর পেলে পুলিশ কিছুই করতে পারে না।'

রিস্টোর কথা শোনার পরও ওর জন্য ভাবনা হচ্ছিলো নীলের। রিস্টোকে গোয়েন্দা পুলিশ খুঁজছে ওর বাবার সঙ্গে। এই মুহূর্তে ওরা যদি ধরা পড়ে নীলের কিছুই হবে না, পরিচয় জানলে ছেড়ে দেবে, বড়জোর বাবাকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু রিস্টোকে ঠিকই ধরে নিয়ে যাবে। বাবা মার একমাত্র ছেলে ও। রিস্টো ধরা পড়লে ওর মা লিলিয়া গিয়র্গিয়েভা নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবেন।

সোফিয়া আসার পর থেকে প্রেসিডেন্ট ঝিভকভের ভালোমন্দ নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় নি নীল। রাজনীতির ব্যাপারে ওর উৎসাহ শুধু বই পড়া আর ছবি দেখার ভেতর সীমাবদ্ধ। রিস্টো বিপদে পড়ার পর থেকে ও ঝিভকভ আর তার গোয়েন্দা পুলিশের দলকে ভীষণ অপছন্দ করা আরম্ভ করেছে। মনে মনে ঠিক করলো রবিনকে আজ রিস্টোর কথা বলবে। বাবাকে বলতে হবে ইলিনা মিরকোভাকে যেন কালই চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেন। পাজি মহিলা, বসে বসে গোয়েন্দাগিরি করছে আর দেখা হলেই সোনাহেন মুখ করে কতো মিষ্টি কথা! বলে কিনা সিটিযেন কমিটির সাপোর্টার। ইভান ইভানভ ঠিকই বলেছেন, আস্ত ডাইনি একটা, বাবাকে বিপদে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে রিস্টো ভাবছিলো নীলের কথা। যদি নীলের কিছু হয় কোনও দিন ওর বাবা মা'র কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। দু'দিন মাত্র গিয়েছে নীলদের বাড়িতে। কী চমৎকার মহিলা নীলের মা, কত যত্ন করে খাইয়েছেন রিস্টোকে। নীলের বাবা ওকে চমৎকার একটা আমেরিকান কলম উপহার দিয়েছিলেন।

গোয়েন্দ পুলিশ যে ওদের ধরার জন্য কত বড় ঘেরাও করেছিলো রিস্টো ধারণা করতে পারে নি। পুলিশের সঙ্গে মিলিশিয়াও ছিলো। রিস্টো ভেবেছিলো অন্যান্যবার যেভাবে আসে পুব দিক দিয়ে সদর রাস্তা দিয়ে ওরা গ্রামে ঢুকবে, রিস্টোরা পশ্চিমের পথ দিয়ে পালিয়ে যাবে। এবার পুলিশ ভালোরকম প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। বেশ দূর থেকেই ওরা দেখতে পেয়েছে রিস্টো আর নীলকে। ওদের আগেই বলা হয়েছে দেশদ্রোহী সিটিযেন কমিটির লোকদের সঙ্গে কমবয়সী একটা বিদেশী ছেলেও আছে। ওর ব্যাপারে কী করতে হবে সেই নির্দেশও দেয়া আছে।

জালে যেভাবে পাখি ধরা পড়ে রিস্টো আর নীল গ্রাম থেকে বার্চবনে ঢোকার মুহূর্তে ঠিক সেভাবে ধরা পড়লো পুলিশের হাতে। ওরা টেরও পায় নি চারদিক থেকে কখন ওদের ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে। পুলিশের হাতে পস্তিল, মিলিশিয়ার হাতে স্টেনগান। কর্কশ গলায় একজন বললো, 'মাথার ওপর হাত তোলো।'

যন্ত্রচালিতের মতো হাত তুললো নীল আর রিস্টো। একজন এসে রিস্টোকে সার্চ করলো। কোন অস্ত্র পেলো না। রিস্টোর ব্যাগটা নিয়ে গেলো। ব্যাগ খুলে বের করলো একতাড়া ইশতেহার। হাতকড়া হাতে একজন এসে রিস্টো আর নীলের হাতে ওটা পরিয়ে দিলো। নীল কিছুটা ভয় পেলেও রাগী গলায় বললো, 'আমাকে কেন হাতকড়া পরাচ্ছেন? জানেন আমি কে?'

অফিসার গোছের একজন ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'খুব ভালো করেই জানি তুমি একজন রাষ্ট্রদূতের ছেলে। তবে এ মুহূর্তে দেশদ্রোহীদের সাহায্যকারী একজন ঘৃণ্য

অপরাধী ছাড়া তুমি আর কিছু নও। ওদের সঙ্গে তোমাকেও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।'

দু'জন বিশালদেহী মিলিশিয়া ওদের দু'জনকে ধরে নিয়ে চারদিক বন্ধ একটা প্রিজন ভ্যানে নিয়ে তুললো। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর নীল আর রিস্টো দু'জনই বুঝলো গাড়িটা সোফিয়ার উল্টো দিকে যাচ্ছে।

শুভাকাঙ্খী প্রফেসর ইয়াভরভ

নীলের বাবার সঙ্গে সকালে বেরিয়েছিলো রবিন। সাড়ে নটায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা মার্কো কোযিনভ এসেছিলেন দূতাবাসে। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কিছু কথা সেরে রবিনের সঙ্গে বসেছিলেন আলোচনায়। ওঁর সঙ্গে প্রায় দু'ঘন্টা কাটিয়েছে রবিন। নিখিলদা যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে বলেছিলেন সেগুলো ছাড়াও রবিন প্রশ্ন করেছে, সোফিয়ার রাস্তা ভিখিরি কেন, ডলারের জন্য এখানে এত হাহাকার কেন, সিটিযেন কমিটি সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য কী— এইসব। বারোটায় নীলের বাবার সঙ্গে কেমিক্যাল প্ল্যান্ট দেখতে গিয়েছিলো রবিন। লাঞ্চ ওখানেই করেছে। কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছে।

ওদের সঙ্গে দোভাষী হয়ে গিয়েছিলো ইলিনা মিরকোভা। এক ফাঁকে ও রবিনকে জিজ্ঞেস করলো, 'বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তোমার এত উৎসাহ কেন?'

রবিন গম্ভীর হয়ে বলেছে, 'তোমার বয়সীরা ধারণাও করতে পারবে না, তোমাদের এই গরিব দেশের মানুষের মুক্তির জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে কত রক্ত দিতে হয়েছে। বুলগেরিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস আমি পড়েছি মিস ইলিনা।'

ঠোঁট উল্টে ইলিনা বলেছে, 'স্কুলে আমাকেও পড়তে হয়েছে। তাতে লাভ কি হলো, সারা দেশ জুড়ে ঝিভকভের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে।'

ইলিনার কথাবার্তা রবিনের ভালো লাগে নি। এড়িয়ে গেছে ওকে। বিকেলে তোব।রক ওকে নিয়ে গিয়েছিলো ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ-এর পত্রিকা 'নারোদনা ম্লাদেঝ'-এর অফিসে। তরুণ কমিউনিস্টদের কথাবার্তা শুনে রবিন ঘাবড়ে গেছে। পত্রিকায় দেখলো আমেরিকান পপ গ্রুপের ওপর বিরাট ফিচার, সোফিয়ার ডিস্কো ক্লাবে যারা যায় তাদের সাক্ষাৎকার, ফ্যাশনের পাতা আর গল্প কবিতা। গোটা পত্রিকায় রাজনীতি সম্পর্কে কোন লেখা দেখলো না। একটা সিরিয়াস লেখা চোখে পড়েছে

বুলগেরিয়ার জাদুঘরগুলোর ওপর।

নিখিলদার কথা ভাবলো রবিন। এক কপি পত্রিকাও সঙ্গে নিয়েছে। অনেক ছবি আছে দেখলে আঁতকে উঠবেন নিখিলদা। পোল্যান্ডের ব্যাপারে নিখিলদা যে বলেছিলেন নামেই ওরা কমিউনিস্ট, এদের দেখে শুনে রবিনেরও মনে হলো এরা নামেই শুধু কমিউনিস্ট, কাজে নয়।

বিকেলে মেজো চাচার সঙ্গেই বাড়ি ফিরলো রবিন। ভেবেছিলো বাড়ি এসে নীলের দেখা পাবে। চাচী বললেন, 'ওর ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। রিস্টোর গ্রামের বাড়ি গেছে। ওকে পেলে নীলের আর সময় জ্ঞান থাকে না।'

'আজ রাতে যে ওকে আর আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন প্রফেসর বরিস?'

'তিনি আবার কে?' জানতে চাইলেন মেজো চাচা।

প্রফেসর বরিস সম্পর্কে যা জানতো সব ওঁকে খুলে বললো রবিন। শুনে মেজো চাচা বললেন, 'ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টর মনে হচ্ছে। নীল যদি সাতটার ভেতর না ফেরে তাহলে তুমি একাই চলে যেও। তোবারক তোমাকে নিয়ে যাবে।'

একা যাওয়ার কথা শুনে রবিনের খারাপ লাগলো। ও চাইছিলো নীল সাতটার ভেতর ফেরত আসুক। বাইরে গিয়ে তোবারকের সঙ্গে কিছুক্ষণ ব্যাডমিন্টন খেললো রবিন। এক গেম খেলার পর আর খেলতে ইচ্ছে করলো না। তোবারক বললো, 'রবিন বাইরে আজ একটু পেরেশান মনে হইতেছে।'

রবিন সামান্য হাসলো— 'কিছুই মেলাতে পারছি না তোবারক। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যা ভাবতাম এখানে এসে দেখি একেবারে অন্যরকম।'

ওক গাছের নিচে বসে কথা বলছিলো ওরা। তোবারক সিগারেটের প্যাকেট বের করে রবিনকে একটা দিয়ে নিজে একটা নিলো। আগুন ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'কিছুদিন থাকেন রবিন বাই। আরো অনেক কিছু দেখতে ফাইরবেন।'

রবিন প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'তুমি যদি আমাকে আপনি আর ভাই বলো আমাকেও যে তাই বলতে হবে। এসব বললে কি বন্ধু হওয়া যায়।'

বিব্রত হেসে তোবারক বললো, 'আমনে কোথায় আর আমি কোথায়–'

'তাতে কি তোবারক! আমার কাছে সব কাজই সমান। এতদিন এ দেশে আছো, তোমার মুখে এসব বস্তাপচা কথা মানায় না।'

তোবারককে কখনো কেউ এত আপন ভেবে কথা বলে নি। রবিনের কথা শুনে ওর কান্না পেলো। আস্তে আস্তে বললো, 'তোমার মতো একজন বন্ধুর কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই রবিন।'

রবিন মৃদু হেসে বললো, 'ভাবার কি আছে, পেয়েই তো গেলে তোবারক।'

'দেশে গেলে আমার কথা মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই থাকবে। আমি তোমাকে চিঠি লিখবো।'

তোবারকের মনে হলো আজকের দিনটা ওর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। নীলের কথা মনে হলো ওর। নীল শুনলে নিশ্চয় খুব খুশি হবে। বললো, 'আমাদের বন্ধুত্বের কথা কি নীলকে বলবো রবিন?'

রবিন শব্দ করে হাসলো— 'কেন বলবে না? এতে লুকোবার কি আছে! চাচারাও তো তোমাকে ঘরের ছেলের মতো দেখেন তোবারক।'

'তা দেখেন।' স্বীকার করলো তোবারক— 'এই স্যারের মত মানুষ হয় না।'

হাতের ঘড়ি দেখে রবিন বললো, 'সাড়ে ছটা বাজে। চলো ওঠা যাক। নীল তো এলো না। তুমি আমাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে নিয়ে যাবে।'

'তুমি ড্রেস চেঞ্জ করবে না?'

'পাঁচ মিনিট লাগবে।' বলে রবিন উঠে চলে গেলো।

তোবারক আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে রবিনের কথা ভাবলো। ঠিক করলো রবিনকে একটা চামড়ার জ্যাকেট উপহার দেবে। তোবারক দেখেছে আমেরিকান টুরিষ্টরা পাগলের মতো এসব জ্যাকেট কেনে। আমেরিকায় নাকি অসম্ভব দাম এগুলোর।

নাফিসার দেয়া স্যুট পরে রবিন যখন নিচে নামলো রীন মুগ্ধ হয়ে বললো, 'তোমাকে হলিউডের হিরোদের মতো লাগছে রবিনদা।'

মেজো চাচাও মৃদু হেসে বললেন, 'তোর স্যুটটা চমৎকার হয়েছে। কোত্থেকে বানিয়েছিস?'

লাজুক হেসে রবিন বললো, 'আমি বানাই নি। রোমে নাফিসা আন্টি প্রেজেন্ট করেছেন।'

'তাই বল। দেখলেই বোঝা যায় দামী জিনিস।'

রবিন বাইরে এসে দেখলো গাড়ি বারান্দার নিচে তোবারক অপেক্ষা করছে। ওকে দেখে তোবারক পেছনের দরজা খুলে দিলো। রবিন কাছে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সামনের সিটে বসতে বসতে বললো, 'ফাজলামো হচ্ছে, না?'

তোবারক গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললো, 'যে ড্রেস ফরছো মনে হয় না তোমারে নিয়া রাতে বাসায় ফিরতে ফারুম।'

'কেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে কোথায়?'

'গ্র্যাণ্ড হোটেলের সঙ্গে একটা ডিসকো ক্লাব আছে। সোফিয়ার সেরা সুন্দরীরা ওইখানে নাচতে আসে। তোমারে দেখলে ওদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'যেন সোফিয়ার মেয়েরা তোমাকে পছন্দ করে না!'

কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তোবারক বললো, 'ফছন্দ কইরতো, যদি তুমি সঙ্গে না থাইকতে।'

'থাক থাক, বেশি গ্যাস দিতে হবে না।'

'একদিন যাইবা নাকি ডিসকোতে?'

'দেখা যাক।'

দশ মিনিটের মধ্যে ওরা গ্র্যান্ড হোটেল সোফিয়ায় পৌঁছে গেলো। তোবারক পার্কিং-এ গাড়ি রেখে বললো, 'তুমি ডিনার শেষ করে আস। আমি গাড়িতেই আছি।'

'না তোবারক।' রবিন বললো, 'তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হইছে রবিন। আমি তোমার সঙ্গে ডিনার করুম এই হোটেলে?' আকাশ থেকে পড়লো তোবারক।

'প্রফেসর তিনজনের জন্য টেবিল বুক করেছেন। তুমি আমার বন্ধু। আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে প্রফেসর খুশি হবেন।'

'না রবিন, তা হয় না।'

'না হলে আমিও যাচ্ছি না ডিনারে।'

বাধ্য হয়ে তোবারককে আসতে হলো রবিনের সঙ্গে। তোবারক মুখে যতই বিনয় করুক, রবিনের বন্ধু হিসেবে ওকে মোটেই বেমানান মনে হচ্ছিলো না। টুপিটা গাড়িতে রেখে এসেছে। সাদা কোট প্যান্ট ওর পরনে, গলায় নীল সাদা স্টাইপ টাই, সবার ওপরে ওর সুন্দর স্মার্ট চেহারা— হোটেলের ডোরম্যান সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিলো ওদের।

লবি পেরিয়ে দোতালায় ডাইনিং হল। কাউন্টারে বসা লোকটা জানতে চাইলো রিজার্ভেশন আছে কিনা।

রবিন প্রফেসর বরিসের নাম বলতেই একজন ওয়েটার ওদের ভেতরে নিয়ে গেলো। প্রফেসর বরিস অতিথিদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। তাঁর সামনে আধ গ্লাস সাদা মদ। রবিন প্রথমেই বললো, 'শুভ সন্ধ্যা প্রফেসর বরিস। নীল এক জায়গায় বেড়াতে গেছে। আমার বন্ধু তোবারককে সঙ্গে এনেছি। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।' ব্যস্ত গলায় বললেন প্রফেসর বরিস— 'ডিনারে তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছি মিঃ তোবারক।'

প্রফেসরের বাড়িয়ে দেয়া হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোবারক ইংরেজিতে বললো, 'ধন্যবাদ স্যার। আপনার সঙ্গে পরিচিতি হতে পেরে আনন্দিত হয়েছি।'

রবিন প্রফেসরকে বললো, 'তোবারক সাত বছর ধরে এদেশে আছে। ইচ্ছে করলে আপনি বুলগেরিয়ান ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

'তাই নাকি তোবারক?' প্রফেসর বুলগেরিয়ান ভাষায় বললেন, 'যতই লণ্ডনে থাকি আর ইংরেজি কপচাই, নিজের মাতৃভাষায় কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমি আর কিছুই চাই না।'

'আপনি নিশ্চয় বহুদিন ধরে দেশের বাইরে আছেন?'

'আরে, কি চমৎকার বুলগেরিয়ান ভাষা বলো তুমি! আমি কোন বিদেশীর মুখে এত সুন্দর বুলগেরিয়ান শুনি নি।'

তোবারক বিব্রত হেসে বললো, 'আমি আমার মাতৃভাষা ঠিক মত শিখতে পারি নি। তাই বুলগেরিয়ান ভাষা যত্ন করে শিখেছি।'

ওয়েটার এসে টেবিলে দু' গ্লাস রেড ওয়াইন রেখে গেলো। প্রফেসর বললেন, 'আমি খাঁটি বুলগেরিয়ান রাকিয়া নিয়েছি। তোমাদের জন্য এ পানীয়টি বেশি কড়া হবে বলে রেড ওয়াইনের কথা বলেছি।'

রবিন আর তোবারক দৃষ্টি বিনিময় করলো। প্রফেসর গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন, 'আমাদের বন্ধুত্ব ও বুলগেরিয়া প্রীতির উদ্দেশে।'

রবিন আর তোবারক গ্লাস তুললো। তোবারক বুলগেরিয়ান ভাষায় প্রফেসরের স্বাস্থ্য কামনা করলো। রবিনও প্রফেসরের দীর্ঘ জীবন কামনা করলো।

ডিনারের মেনু দেখে প্রফেসর জানতে চাইলেন, 'তোমরা বুলগেরিয়ান ডিনার পছন্দ করবে, না কন্টিনেন্টাল?'

রবিন বললো, 'বুলগেরিয়ান।'

তোবারক বললো, 'রবিন হচ্ছে প্রধান অতিথি। ওর পছন্দই আমার পছন্দ।'

'আমার মতে পৃথিবীর সেরা খাবার হচ্ছে বুলগেরিয়ান।' এই বলে প্রফেসর হা হা করে হাসলেন।

পাঁচ কোর্সের ডিনারের অর্ডার দিলেন প্রফেসর। ওয়েটার প্রথমে এ্যাপেটাইযার হিসেবে দিয়ে গেলো ঠাণ্ডা সালাদ। ভিনেগারে জারানো শসা, চিনি আর লেবুর রস দেয়া লাল বাধাকপির কুচি, টম্যাটো আর জারানো জলপাই।

রবিন প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার আর কোন অসুবিধে হয় নি তো?'

'আর অসুবিধে হবে না।' প্রফেসর বিষণ্ন গলায় বললেন 'এতদিন ধরে আমেরিকানরা বলছিলো আমেরিকান পাসপোর্ট নিতে। রাজী হই নি। ভাবতাম দেশ ছেড়ে চলে গেছি, এই বুলগেরিয়ান পাসপোর্টই আমার একমাত্র অবলম্বন। ঝিভকভের পা চাটারা আমাকে সেদিন বাধ্য করেছে আমেরিকান পাসপোর্ট নিতে। আমেরিকান এ্যাম্বাসাডর এদের ফরেন মিনিষ্ট্রিকে বলে দিয়েছেন আমার কিছু হলে আমেরিকানরা এটাকে শক্তভাবে নেবে।'

'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রফেসর বরিস, যদি কিছু মনে না করেন।'

'নিশ্চয়ই করতে পারো। তার আগে বলা দরকার, আমার নাম বরিস নয়, আমি এ্যান্থপলজির প্রফেসরও নই। আমার নাম দিমিতির ইয়াভরভ। আমি একজন পদার্থ বিজ্ঞানী। প্রফেসর বলতে পারো, কিছুদিন সোফিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি। একসময় ঝিভকভের উপদেষ্টা ছিলাম, এখন নাসার একজন পরিচালক। বিশেষ কারণেই আমাকে আসল পরিচয় গোপন রেখে চলাফেরা করতে হয়। আশা করি এরপর তুমি কিছু মনে করবে না।'

'ধন্যবাদ প্রফেসর ইয়াভরভ। আমার জানতে ইচ্ছে করে আপনি কেন দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?'

কয়েক মূহূর্ত কোন কথা বললেন না দিমিতির ইয়াভরভ। ওয়েটার এসে সস দেয়া ট্রাউট মাছ ভাজি, ল্যাম্ব রোস্ট, আর সস মাখানো সবজির পুর দেয়া আলুর চপের মত এক ধরনের খাবার পরিবেশন করলো। বুড়ো বিজ্ঞানী নিজ হাতে রবিন আর তোবারকের পাতে রোস্ট, ভাজা মাছ আর চপ তুলে দিলেন। তারপর নিজের পাতে নিলেন। ছুরি আর কাঁটাচামচ দিয়ে ট্রাউট মাছের টুকরো থেকে কাঁটা বেছে মুখে ফেললেন। বললেন, 'বহুদিন পর দেশী খাবার খাচ্ছি, কেমন লাগছে?'

রবিন আর তোবারক দুজনই বললো, 'চমৎকার।'

'ও হ্যাঁ! রবিন একটা প্রশ্ন করেছিলে!' এক টুকরো চপ মুখে ফেলে ইয়াভরভ বললেন, 'অল্প কথা তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন। তবু সংক্ষেপে বলছি। আমেরিকায় কাজ করি বলে ভেবো না সাম্রাজ্যবাদের দালালী করার জন্য দেশ ছেড়ে

পালিয়েছি। এক সময় আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসীদের সঙ্গে লড়াই করেছি। গিয়র্গি দিমিত্রভ আমাকে ভালোভাবে চিনতেন। বিপ্লবের পর দেশ গড়ার কাজে ডুবে গেলাম। দশ বছর গবেষণাগারে কাটিয়েছি, নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য। কাজের অনেক স্বীকৃতিও পেয়েছি। শেষে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পর্যন্ত হয়েছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সাধারণ মানুষ পার্টি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের অবস্থা যেভাবে বদলে যাবে ভেবেছিলাম সে রকম কিছু হয় নি, অবস্থা বদলেছে পার্টি নেতাদের। দেখলাম কাজ করে দেয়ার জন্য নেতারা ঘুষ নিচ্ছে, স্বজনপ্রীতি করছে, আরো নানারকম দুর্নীতি করছে। সরকার আর পার্টি সব একাকার হয়ে গেছে। পার্টির সদস্য না হলে যোগ্য লোকদের কোনঠাসা করে রাখা হচ্ছে, ক্ষমতা অল্প কিছু নেতার হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে। সব কিছু দেখে শুনে ভীষণ খারাপ লাগলো। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। শুনলাম দু'একজন আমার মতো একা প্রতিবাদ করতে গিয়ে এ পৃথিবী থেকে অসময়ে হারিয়ে গেছে। নিজের অক্ষমতার ওপর রাগ হলো। দেখলাম দেশে থাকলে এসব অনাচারের দায় বহন করতে হবে। তাই ঠিক করলাম পালিয়ে যাবো। তুমি বোধহয় জানো না, আমাদের পালিয়ে যাওয়ার জায়গা হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ নয় আমেরিকা। কোনও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশে গেলে তারা আমাকে আবার ঝিভকভের হাতে তুলে দিতো।'

রবিন খেতে খেতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বুড়ো প্রফেসরের কথা শুনছিলো। প্রফেসরের কথা শেষ হওয়ার পর বললো, 'আপনি কি সবগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশকে তথাকথিত বলবেন? সত্যিকারের সমাজতন্ত্র কি কোনও দেশে নেই?'

'না নেই।' শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর ইয়াভরভ— 'এসব দেশে সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়ার কম বেশি চেষ্টা হয়েছিলো। কিন্তু সফল কোথাও হয় নি। তুমি আমার সঙ্গে দ্বিমত অবশ্যই পোষণ করতে পারো, আমি বলছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণের কথা।'

'আপনি কি ঝিভকভের বিরুদ্ধে সিটিযেন কমিটি গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন করছে তার সঙ্গে জড়িত?'

'আগে পুরোপুরি জড়িত হওয়ার সুযোগ আমার ছিলো না। অবশ্যই এখন আমি ওদের একজন।'

'আপনার কি ধারণা বুলগেরিয়ায় গণতন্ত্র এলে রাস্তায় আর ভিখিরি থাকবে না, গরিবরা সব ধনী হয়ে যাবে?'

'আমি তা বলছি না। গণতন্ত্র হলে মানুষের কিছু সান্ত্বনা থাকে, ইচ্ছে মত সরকার বদলাতে পারে, সরকারে যারা থাকে তাদেরও জবাবদিহি করতে হয় মানুষের কাছে, একজন প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারেন না।'

'আপনার কি মনে হয় একজন কমিউনিস্ট হিসেবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে আপনি ভুল করেছিলেন?"

'না তাও মনে করি না। তখন আমাদের সামনে বিকল্প কি ছিলো? পরে আমার

মনে হয়েছে সমাজতন্ত্র অত্যন্ত উন্নত এক মতবাদ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নত সমাজ দরকার। উন্নত সব অর্থে। তুমি সব কিছু বুঝবেও না। হয়তো আগামী শতাব্দীতে তোমরা দেখবে সমাজতন্ত্রের সত্যিকারের বিজয়যাত্রা।'

প্রথমে প্রফেসর সম্পর্কে রবিনের ধারণা ছিল তিনি বুঝি বলবেন সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, হেনতেন নেই— এইসব। প্রফেসরের সব কথা শোনার পর মনে হলো এ নিয়ে আরো পড়াশোনা করতে হবে, ভাবতে হবে।

ওদের খাওয়ার পর কয়েক রকম ফলের সালাদ দেয়া হয়েছিলো। একজন ওয়েটার রেড ওয়াইনের গ্লাস সরিয়ে শ্যাম্পেনের গ্লাস দিয়ে গেছে। প্রফেসর শ্যাম্পেন টোস্ট করলেন। জীবনে প্রথম শ্যাম্পেনের স্বাদ গ্রহণ করলো রবিন। তোবারককে মনে হলো নির্বিকার।

ডিনার শেষ হতে হতে সাড়ে আটটা বাজলো। তোবারক বুলগেরিয়ান ভাষায় প্রফেসরকে ডিনারের জন্য ধন্যবাদ জানালো। বললো, 'প্রত্যেকটা ডিশই অত্যন্ত উপাদেয় ছিলো।'

প্রফেসর বললেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি তোমরা আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছো বলে। আরও ভালো লাগতো সেই সাহসী ছেলেটিও যদি আসতো। কী যেন নাম ওর? দাঁড়াও, মনে পড়েছে— নীল। ওকে বলবে আমার কাছে ওর একটি ডিনার পাওনা আছে।'

তোবারক নীলের বাবার ভিজিটিং কার্ড প্রফেসরকে দিয়ে বললো, 'নীল খুশি হবে আপনি নিজে যদি ওকে নেমন্তন্ন করেন। আমাদের রাষ্ট্রদূত খুশি হবেন আপনার মতো একজন ভিআইপি যদি তাঁর ছেলের প্রশংসা করেন।'

কার্ডখানা পকেটে পুরে প্রফেসর বললেন, 'তুমি ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো বাছা। নীলের জন্য অবশ্যই ওর বাবাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিৎ। নীল আমার জীবনরক্ষা করেছে।'

ডাইনিং রুম থেকে বেরুতে বেরুতে রবিন বললো, 'আপনি কোথায় যাবেন বলুন। আপনাকে নামিয়ে দিই।'

'ধন্যবাদ রবিন।' মৃদু হেসে প্রফেসর ইয়াভরভ বললেন, 'আমি এখন আমেরিকান এ্যাম্বাসাডারের অতিথি হয়ে তাঁর বাড়িতে আছি। ওদের গাড়ি বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

প্রফেসরের সঙ্গে ওরা হোটেলের কাচের দরজা ঠেলে পোর্টিকোতে দাঁড়াতেই নিঃশব্দে ধবধবে সাদা লিমোযিন এসে থামলো ওদের সামনে। প্রফেসর উঠে বসে শুভরাত্রি জানালেন। রবিন আর তোবারক প্রফেসরকে বিদায় জানিয়ে ওদের গাড়িতে উঠলো। যেতে যেতে তোবারক বললো, 'তোমারে আমার থ্যাংকস দেয়া উচিৎ রবিন। তোমার জন্য এত বড় একজন ভিআইপির সঙ্গে ডিনার করলাম।'

মৃদু হেসে রবিন বললো, 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, তুমি যেভাবে প্রফেসরের সঙ্গে বুলগেরিয়ান ভাষায় কথা বলছিলে, নিজেকে একজন ফালতু লোক মনে হচ্ছিলো আমার।'

'কিছুদিন থাকো। তোমারে বুলগেরিয়ান শিখাই দেবো।'

'এই দু' দিনে মাত্র দুটো শব্দ শিখেছি। দা আর দেব্রে। দা মানে হ্যাঁ, দেব্রে মানে ঠিক আছে। ঠিক কিনা বলো?'

রবিনের কথা শুনে গলা খুলে হাসলো তোবারক। হাসতে হাসতে বললো, দেবে।'

বাড়ি ফিরে রবিন প্রথমেই ওর চাচীকে নীলের কথা জিজ্ঞেস করলো। চাচী বললেন, 'এখনো ফেরে নি। নটা বাজতে চলেছে। মনে হয় না আজ ফিরবে। আগেও দুবার রিস্টোদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে।'

রীন ওপরে ওর ঘরে নাচের প্র্যাকটিস করছিলো। নিচে রবিনের গলা শুনে এক ছুটে নেমে এলো। বললো, 'পলা কে রবিনদা?'

রবিন অবাক হয়ে বললো, 'একটা মেয়ে, কেন?'

'আহ, মেয়ে তো নাম শুনেই বোঝা যায়। তুমি এই মেয়েটাকে চেনো কি করে বলবে তো?'

'রোমে আলাপ হয়েছে। ওর কথা কে বললো তোকে?'

'শুধু আলাপ নয় রবিনদা!' রহস্যভরা গলায় রীন বললো, 'শুধু আলাপের মেয়ে হলে এত এ্যাংশাস হয়ে টেলিফোন করতো না। বললো, তোমার উচিৎ ছিলো এখানে এসেই ওকে ফোন করা। না করে অন্যায় কাজ করেছো।'

রবিন আড়চোখে একবার তোবারককে দেখলো। তোবারক রবিনকে দেখছিলো। দৃষ্টি বিনিময় হতেই ও মুখ টিপে হেসে সিলিং-এ ঝোলানো ঝাড়বাতিটা দেখতে লাগলো। রবিন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে! আমি ভেবেছিলাম রোমে ফেরার টিকেট কনফার্ম করে ফোন করবো।'

চাচী এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলেন। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, মেয়েটা বুঝি নাফিসা আপার বাড়িতে থাকে?'

রীন বললো, 'দেখতে কেমন রবিনদা?'

রবিন লাজুক হেসে বললো, 'ফ্রান্স থেকে এসেছে রোমে বেড়াতে। নাফিসা আন্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আন্টিই বললেন ওর ওখানে থাকতে।'

রীন অধৈর্য হয়ে বললো, 'আহ্, দেখতে কেমন বলো না!'

'ভালোই দেখতে। তবে তোর মতো নয়।'

মুখ টিপে হেসে রীন বললো, 'দেখা যাবে। আমি ওকে আর নাফিসা আন্টিকে বলেছি তুমি এখানে থাকতে থাকতে এসে যেন বেড়িয়ে যায়।'

রীনের কথা শুনে রবিনের খুবই ভালো লাগলো। আড়চোখে দেখলো, তোবারক ওর দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে দুষ্টুমির হাসি।

রবিনের মেজো চাচা ড্রইংরুমের এক কোণে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। এতক্ষণ পর মুখ তুলে বললেন, 'নাফিসা আপা এলে ভালোই হয়। রোমে গেলে কী যে করেন না! কতবার বললাম, কাছেই তো সোফিয়া— এলেন না।'

চাচী কী যেন বলতে যাবেন এমন সময় টেলিফোন বাজলো। রীন টেলিফোন ধরে রবিনকে ডাকলো— 'তোমার ফোন রবিনদা, আমেরিকান এ্যাম্বাসাডরের বাড়ি থেকে।'

তোবারক বললো, 'নিশ্চয় প্রফেসর ইয়াভরভ।'

রবিন ফোন ধরতে গেলো। রীন বললো, 'প্রফেসর ইয়াভরভ কে, যিনি রবিনদাকে ডিনারে ইনভাইট করেছিলেন?'

'জ্বি আফা। সাংঘাতিক মানুষ। ঝিভকভের এ্যাডভাইজার আছিলেন, ফরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এখন নাসার ডিরেক্টর।'

প্রফেসরের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে রবিন ফ্যাকাশে মুখে এসে বললো, 'চাচা, প্রফেসর আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

রবিনের চেহারা দেখে তোবারক ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলো, 'কি হয়েছে রবিন, প্রফেসরের কি আবার কোন বিপদ হয়েছে?'

রবিন একবার তোবারককে দেখলো, আরেকবার ওর চাচীকে দেখলো। কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলো। যা বলার মেজো চাচা বলুক সবাইকে।

দু'মিনিট পর মেজো চাচা এসে চাচীকে বললেন, 'আজ দুপুরে নীল আর রিস্টোকে পুলিশ বয়ানা থেকে এ্যারেস্ট করেছে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেলো। রবিন এ কথাটাই প্রফেসরের কাছে শুনেছে। প্রফেসর ঘরে ফিরেই খবর পেয়েছেন। রিস্টো নাকি ওঁর নাতি হয়।

নীলের মা ভাঙা গলায় বললেন, 'এসব কী বলছো তুমি? নীলকে কেন এ্যারেস্ট করবে পুলিশ? ও কী করেছে? তুমি এক্ষুণি পুলিশের চীফকে টেলিফোন করো।'

'আমেরিকান এ্যাম্বাসাডর কথা বলেছেন পুলিশের সঙ্গে। পুলিশ বলেছে এ ধরনের গ্রেফতারের কোন খবর ওদের জানা নেই।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন নীলের মা— 'তাহলে কী হবে! কোথায় আমার নীল?'

'কেঁদো না মিনু।' ভেজা গলায় বললেন নীলের বাবা— 'আমার মনে হচ্ছে এটা সিক্রেট পুলিশের কাজ। আমাকে পার্টি লাইনে মুভ করতে হবে। এক্ষুণি বেরুচ্ছি আমি।'

রবিন বললো, 'চাচা আমি আপনার সঙ্গে যাবো।'

'ঠিক আছে চল।' বলে রবিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গাড়িতে উঠলেন।

তোবারক ঝড়ের বেগে গাড়ি চালালো নাইনথ সেপ্টেম্বর স্কয়ারে পার্টির সদর দফতরের দিকে।

গোপন কারাগারে রিস্টো ও নীল

জায়গাটা ছিলো গভীর বনের ভেতর পুরোনো এক সামরিক ঘাঁটি, যেখানে ছোটখাট জেলখানাও রয়েছে। সোফিয়া থেকে দূরত্ব গাড়িতে দেড়-দু ঘন্টার মত। সবচেয়ে কাছের জনপদ আলাবিন এখান থেকে তিন মাইল দূরে। প্লভদিভ সাতাশ মাইল। নীলকে রাখা হয়েছে দশ বাই বারো ফুটের একটা কামরায়। এখানে আসার পরে চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেছে। দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটো সরু লোহার খাট পাতা, ওপরে কম্বল বিছানো। এক কোণে পানির কল আর চেয়ার কমোড। সামনের দেয়ালে মোটা লোহার শিক দিয়ে বানানো দরজা, উল্টোদিকে সিলিং-এর কাছে ভেন্টিলেটারের মত ছোট জানালা। জানালায় দরজার মত লোহার শিক দেয়া। দেয়ালগুলো ভারি আর স্যাঁতসেঁতে। দেখেই মনে হয় এসব ঘর কয়েদখানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বানানো হয়েছে। বিশেষ ধরনের বন্দীদের রাখা হয় এখানে।

নীলের ঘরের দু'পাশে আরো পাঁচ ছয়টা ঘর রয়েছে, সেগুলোর ভেতর কোনও লোকজন নেই। ভারি একটা লোহার দরজা পেরিয়ে এসব ঘরে আসতে হয়। সেই দরজার কাছে একজন বন্দুকধারী প্রহরী। গোটা জায়গাটা কবরের মতো নিস্তব্ধ। আটঘন্টা পর পর প্রহরী বদল হয়। মাঝে মাঝে প্রহরীদের বুটের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না।

গতকাল দুপুরে এখানে আনার পর রিস্টোকে ওরা অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। তখন থেকে এই বন্ধ সেল-এ নীল একা। তিনবেলা বাটিতে করে ঘন সুপের মতো বস্তু আর এক টুকরো কালো রুটি দিয়ে যায় একজন উর্দিপরা সৈন্য। দরজা খোলে না, চৌকো একটা ছোট ফোকর আছে দরজার নিচে, তার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেয়। আবার একঘন্টা পর এসে নিয়ে যায়। নীল প্রথমে ভেবেছিলো খাবে না, হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে। কাল দুপুরে যে সৈন্যটা খাবার নিয়ে এসেছিলো তাকে নীল ধমক দিয়ে বলেছে, 'এসব নোংরা খাবার আমি খাবো না। তোমাদের অফিসারের সঙ্গে কথা বলবো আমি।'

ভাবলেশহীন চেহারার সৈন্যটা নির্লিপ্ত গলায় বলেছে, তোমার চাওয়া মত অফিসার আসবেন না। অফিসারের দরকার হলে তিনি আসবেন।'

নীল তবু গোঁ ধরে বলেছে, 'আমি এসব খাবার খাবো না।'

'এখানে এ খাবারই খেতে হবে।' আগের মত যান্ত্রিক গলায় বলেছে সৈন্যটা। 'না

খেলে আমার করার কিছু নেই। একঘন্টা পর এসে বাটি নিয়ে যাবো।'

দুপুরের খাবার ফিরিয়ে দিয়েছিলো নীল। বিকেলের পর প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। কল ছেড়ে আঁজলা ভরে পানি খেয়েও খিদে দূর হয় নি। রাতে আবার যখন দুপুরের মত খাবার দিয়ে গেলো, তখন আর ফিরিয়ে দিতে পারে নি নীল। স্বাদহীন সেই ঘন সুপ আর শক্ত কালো রুটি সবটুকু খেয়ে ফেলেছে।

কাল থেকে নীল বাড়ির কথা ভাবছে। মা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি শুরু করেছেন। রীনও লুকিয়ে কাঁদবে। একবার খেলতে গিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিলো। তাতেই মা কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন। তোবারক আর রবিনদা নিশ্চয় মন খারাপ করে বসে আছে। বাবা যখন জানবেন ওকে এ্যারেস্ট করেছে তখন কী করবেন? নীলের একবার মনে হলো বাবা জানবেন কিভাব ওকে যে এ্যারেস্ট করেছে! এখানে আসার পথে বন্ধ ভ্যানে বসে এক ছেলেমানুষি কাণ্ড করেছে রিস্টো। এখন ছেলেমানুষি মনে হলেও তখন নীলও রিস্টোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলো। ওদের ভ্যানে তোলার সময় রিস্টোর ব্যাগটা ভেতরে ছুড়ে দিয়েছিলো মিলিশিয়ার লোকটা। ভ্যান ছাড়ার পর কিছুক্ষণ ওরা দু'জন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইলো। একই হাতকড়ায় নীলের ডান হাত আর রিস্টোর বাম হাত বাঁধা। এবড়ো থেবড়ো পাথুরে রাস্তাটুকু কোনও রকমে পার হয়ে ভ্যানটা হাইওয়েতে উঠে স্পীড বাড়িয়ে দিলো। রিস্টো উঠে লোহার পাতের জানালাগুলো ঠেলতে লাগলো— কোনওটা খোলে কিনা। কয়েকটা জানালা দেখার পর একটার নিচে সামান্য ফাঁক করতে পেরেছিলো। সেই ফাঁকে অনেকক্ষণ চোখ রেখে রিস্টো বললো, 'আমরা প্লভদিভের দিকে যাচ্ছি— ।'

'নীল বললো, 'রাস্তায় লোকজন দেখতে পাচ্ছিস? চীৎকার করলে কেমন হয়?'

'হাইওয়েতে লোক কোথায়? একটা দুটো গাড়ি কেবল দেখা যাচ্ছে। আর লোক থাকলেও চিৎকার করে লাভ হবে না। এরা তো ডাকাত নয় যে আমাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে! এটা প্রিজন ভ্যান। বন্দীদের এসব গাড়িতে করেই নেয়া হয়।'

নীলের মত বুদ্ধিমান ছেলেরও মাথা গুলিয়ে গিয়েছিলো। রিস্টোকে বললো, 'কিছু একটা বুদ্ধি বের কর।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলো রিস্টো। তারপর বললো, 'আমার ব্যাগে সিটিযেন কমিটির কতগুলো ইশতেহার আছে। এগুলোতে লিখে খবর পাঠাবো।'

ব্যাগের ভেতর কলমও ছিলো। রিস্টো ইশতেহারের উল্টো পিঠে লিখলো—

'সিটিযেন কমিটির বন্ধুদের প্রতি। আমার নাম রিস্টো প্লানেভ। আমাকে আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের ছেলে নীলকে মিলিশিয়া ধরে নিয়ে যাচ্ছে প্লভদিভের দিকে। দয়া করে যথাস্থানে খবর দাও।'

লেখা শেষ হলে ইশতেহারটা ভাঁজ করে চলন্ত ভ্যানের জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেললো। কোথায় পড়লো ওরা বুঝতে পারলো না। রিস্টো আরেকটা ইশতেহারে একই কথা লেখা আরম্ভ করলো।

চলন্ত ভ্যানে লিখতে গিয়ে হাতের লেখা দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছিলো। তবু একটার পর একটা ইশতেহারে ওদের কথা লিখে গেছে রিস্টো, আর নীল সেটা ভাঁজ করে জানালার

ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেলেছে। বেশির ভাগ ইশতেহারই বাতাসের ঝাপ্টায় এমন জায়গায় গিয়ে পড়লো যেখানে কোনো মানুষেরই নজর পড়বে না।

বন্ধ কুঠুরিতে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে গিয়ে নীলের একবার মনে হলো, বাবা এতক্ষণে নিশ্চয় খবর পেয়ে গেছেন। গাড়ি নিয়ে রওনাও হয়ে গেছেন প্লভদিভের পথে। রবিনদা আছে, তোবারক ভাই আছে— যথেষ্ট বুদ্ধিমান ওরা। একজন রাষ্ট্রদূতের ছেলেকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা একটা সাংঘাতিক ঘটনা! সোফিয়ার কূটনীতিক মহলে এতক্ষণে নিশ্চয় তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। ঝিভকভের সরকারকে এর জন্য জবাবদিহি করতেই হবে।

রিস্টোর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলো নীল। কোথায় নিয়ে গেছে ওকে? নিশ্চয় মারার আগে ভালোমত জেরা করবে ওকে। কথা বের করার জন্য ওর ওপর নানা কায়দায় অত্যাচারও করবে। রিস্টো কি পারবে সহ্য করতে? এখনো কি বেঁচে আছে রিস্টো? ভাবতে গিয়ে নীলের বুকের ভেতর জমে থাকা কান্নার সমুদ্রে ঝড় উঠলো।

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। নীলের ঘরের সিলিং-এর সঙ্গে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব লাগানো। সন্ধ্যার পর থেকে নীল লোহার খাটে শুয়ে সারাক্ষণ রিস্টোর কথা ভাবছিলো। বার বার ঘুরে ফিরে ওর মনে হচ্ছিলো রিস্টোকে এরা মেরে ফেলবে। ওর মা বাবা কেউ জানবেন না ওদের হাসি খুশি, প্রচণ্ড সাহসী, দয়ালু আর বিনয়ী ছেলেটা কখন কিভাবে মারা গেছে। রিস্টো ওঁদের একমাত্র ছেলে। এসব কথা ভাবতে গিয়ে নীল টেরও পেলো না কখন ওর দু'চোখ বেয়ে কান্না গড়িয়ে পড়েছে।

রিস্টোকে ওরা অন্য কোথাও নেয় নি। নীলকে যে ব্লকে রাখা হয়েছে এরকম আরও একটা ব্লক আছে মূল বাড়িটার উল্টো দিকে। নীল ঠিকই ভেবেছিলো। রিস্টোকে ওরা আলাদা জায়গায় রেখেছে জেরা করার জন্য। সকাল থেকে এক নাগাড়ে জেরা শুরু হয়েছে।

মোটা সোটা এক অফিসার, চেহারাটা বুলডগের মত থ্যাবড়ানো, বসেছিলো চারকোণা লোহার টেবিলের উল্টো দিকে। হাতকড়া লাগানো রিস্টো বসেছে ওর মুখোমুখি।

বুলডগের মত অফিসার প্রথমে ওর নাম, বাবা মার নাম ঠিকানা, নীলের পরিচয় সব নোট করলো। তারপর ঘেউ ঘেউ করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোদের ক্লাসের আর কে কে আছে এসবের ভেতর?'

রিস্টো ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। নির্বিকার গলায় উত্তর দিলো, 'সবাই আছে।'

'সবাই মানে?' চোখ পিট পিট করে প্রশ্ন করলো বুলডগ।

'ক্লাসের সব ছেলে। শুধু ক্লাসের কেন, স্কুলের সব ছেলেই আছে আমাদের সঙ্গে।'

'স্কুলের সব ছেলে মানে নার্সারিতে পড়া ছেলেমেয়েরাও?' সব কথা একটু দেরিতে বোঝে বুলডগ।

'হ্যাঁ, নার্সারির ছেলেরাও।' গম্ভীর গলায় জবাব দিলো রিস্টো।

'তুই বলতে চাস স্কুলে যে পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি আর পলিট ব্যুরোর কমরেডদের

ছেলেমেয়েরা পড়ে— তারাও এসব বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে?'

'বলেছি তো সবাই।'

'নার্সারির তিন বছরের বাচ্চারাও।'

'হ্যাঁ বাচ্চারাও।'

'চোপ নচ্ছাড়!' ঘেউ ঘেউ করে উঠলো বুলডগ— 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে। ভেবেছিস আমি সব জানি না?'

'সবই যদি জানো আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'একশবার জিজ্ঞেস করবো তোকে। ওরে কে আছিস? ছোঁড়াটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছে। একটু ধোলাই দিয়ে যা।'

বুলডগের হাঁক শুনে ষণ্ডামত দু'জন এসে রিস্টোকে শূন্যে ঝুলিয়ে খালি পায়ের তলায় চামড়ার বেত দিয়ে মারলো। কয়েকটা বাড়ি খেয়ে রিস্টোর মনে হলো পায়ের তলায় আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। আরেকজন বেত মারলো পিঠে। রিস্টো কাঁদে নি, চিৎকার করে নি। দাঁতে দাঁত চেপে এগারো পর্যন্ত গুনেছিলো। তারপর সে জ্ঞান হারিয়েছে ছ'ঘন্টার জন্য।

সন্ধ্যায় জ্ঞান ফেরার পর রিস্টো দেখলো ওকে ওর কুঠুরিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। হাতকড়া খুলে দিয়েছে। প্রচণ্ড জ্বালা করছিলো সারা পিঠে। হাত দিয়ে দেখলো মলম জাতীয় কিছু লাগানো হয়েছে সেখানে, বিচ্ছিরি গন্ধ। উঠে বসতে মনে হলো সারা ঘর বুঝি দুলে উঠেছে। মাথায় চক্কর দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকলো রিস্টো। তারপরই বমি করলো। অনেকক্ষণ ধরে বমি করলো সে। বমিতে ঘর ভেসে গেলো। শেষের দিকে সামান্য পানি বেরুলো, মনে হলো পেটের নাড়িভূঁড়ি সব বমির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

বমির শব্দে একজন প্রহরী এসে দরজার ফুটো দিয়ে দেখলো। তারপর একটা ন্যাকড়া এনে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'এক ফোঁটা ময়লা যদি মেঝের ওপর থাকে, রাতে খাবারের বদলে তোকে সেগুলো খাওয়াবো।'

শরীরে এতটুকু শক্তি ছিলো না রিস্টোর। তবু কলের পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বমি পরিষ্কার করলো সে। তারপর চোখ বুজে চিৎ হয়ে পড়ে রইলো খাটের ওপর। হঠাৎ দেখলে মনে হবে রিস্টো বুঝি মারা গেছে।

রাতে কখন খাবার দিয়েছিলো টেরও পায়নি রিস্টো। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলো খাটের ওপর। প্রহরী যথারীতি কোনো কথা না বলে ভরা বাটি ফেরত নিয়ে গেছে। রিস্টোর ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে, যখন ওকে খাবার দেয়া হলো।

শরীর অসম্ভব ক্লান্ত ছিলো। তবু কলের পানিতে মুখ হাত ধুয়ে খাবার খেলো সে। পিঠের আর পায়ের ব্যাথা সামান্য কমেছে। দু'দিনে ওর চোখ বসে গেছে, মনে হয় ওজন কমে গেছে কয়েক পাউন্ড, তবু রিস্টো মনের জোর হারায় নি। দশটার দিকে আবার ওকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বুলডগের জেরার সামনে।

'দিমিতির ইয়াভরভকে কতদিন ধরে চিনিস?' আগের দিনের মত ঘ্যানঘ্যানে গলায় জেরা শুরু করলো বুলডগ।

'আমার জন্মের পর থেকে।'

'ফের ইয়ার্কি মারছিস? দিমিত্রির ইয়াভরভ তোর ধাই নাকি যে জন্মের পর থেকে চিনবি?'

'না ধাই নয়। তিনি আমার দাদু।'

'বটে, কেমনতরো দাদু শুনি?'

'মা'র মামা হন তিনি।'

'আ-আচ্ছা! ভালোই মিলেছে তাহলে। তোরাই তাহলে চিঠি লিখে আনিয়েছিস বুড়ো দেশদ্রোহীটাকে?'

'তিনি নিজেই এসেছেন।'

'তুই কি বলতে চাস বুড়ো তোদের নিয়মিত চিঠি লিখতো না?'

'না, ক্রিসমাসে শুধু কার্ড পাঠাতেন।'

'তোর বাপের সঙ্গে পার্টির কোন কোন নেতার যোগাযোগ আছে, ঠিক মত বল!'

'অনেক নেতারই যোগাযোগ আছে। আমি নাম জানি না।'

'নাম না জানলে বুঝলি কিভাবে ওরা পার্টির নেতা?'

'বাবা বলেছেন।'

'নাচো পাপাঝোভকে চিনিস?'

'না।'

'গিয়র্গি তানেভকে?'

'না। এরা কারা?'

'এরা হচ্ছে পার্টির ভেতর ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা বিশ্বাসঘাতকের দল। তোর বাবা নিশ্চয় চেনে এদের।'

'আমি জানি না।'

'বার বার জানি না, জানি না বলবি না। জানিস, এখান থেকে কথা না বলে কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারে না?'

'জানি না।'

'আবার জানি না?'

'বারে, আগে এখানে এসেছি নাকি যে জানবো!'

'ঠিক আছে, শিগগিরই জেনে যাবি। এবার বল বয়ানাতে তোরা মিটিং করতি কোথায়?'

'সব বাড়িতে।'

'পার্টির কমরেডরা বুঝি তোদের বাড়ি ডেকে জাজিম বিছিয়ে দিতো মিটিং করার জন্য?'

'পার্টির সবাই পার্টির বিরুদ্ধে চলে গেছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'আমার বাবা, মা, দাদুরা সবাই পার্টির সদস্য ছিলেন।'

বুলডগ নিয়ম মাফিক জেরা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আবার ওকে মারতে বললো।

মার খেতে খেতে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রিস্টো। এভাবে ঝিভকভের গোয়েন্দা পুলিশের গোপন কারাগারে আরো একটা ভয়াবহ দিন কাটলো ওর।

বন্ধু কুঠুরির ভেতর এক দুই করে চুয়ান্ন ঘন্টা কেটে গেছে, নীল কোন কথা বলে নি। এই ক' দিনে মনে হলো ওর বয়স তিরিশ বছর বেড়ে গেছে। ধীরে ধীরে অজানা এক ভয় ওর বুকে চেপে বসতে চাইছে। মনে হচ্ছে ঝিভকভ যতদিন বেঁচে আছে ততদিন ওকে এভাবে বন্দী হয়ে দিন কাটাতে হবে। বাবা কিভাবে জানবেন ওকে এই জঙ্গলের ভেতর ওরা আটকে রেখেছে? রিস্টোর সংকেত পাঠানো ইশতেহার বাতাসে কোথায় উড়ে গেছে কে জানে!

সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা। থেকে থেকে দমকা হাওয়া বইছে। কুঠুরির ভেতর ততটা টের না পেলেও ঝড়ো বাতাসে বনের ভেতর গাছের মাতামাতির শব্দ কানে আসে। এ সময় বলকান অঞ্চলে প্রতিবছরেই ঝড় হয়।

নীল ভাবে প্রচণ্ড ঝড়ে যদি উড়ে যেতে এই বন্ধ কুঠুরি! কিম্বা একটা ভূমিকম্পে দেয়ালগুলো যদি ধসে যায়! কিছুই হয় না। শুধু নীলের বুকের ভেতর ভয়ের ক্ষতটা বড় হতে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় নীল যখন লোহার খাটে শুয়ে এলোমেলো এসব কথা ভাবছিলো তখন দরজায় তালা খোলার শব্দ হলো। অসময়ে কে এলো? তবে কি ওর মুক্তির সনদ এসে গেছে? ধড়মড় করে উঠে বসলো নীল। ওর চোখের সামনে দরজা খুলে গেলো। একজন প্রহরীর হাতে ধরা রিস্টো। ঝড়ে বিধ্বস্ত বার্চ গাছের মতো মনে হচ্ছে ওকে। রিস্টোকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কোনো কথা না বলে দরজায় তালা মেরে চলে গেলো প্রহরী।

নীল ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো রিস্টোকে— 'এ কী দশা করেছে তোকে! কেমন করে রিস্টো— ' বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো নীল। হারানো বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে রিস্টোও চোখের পানি আটকে রাখতে পারলো না।

দুই বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলো না। তারপর নীল ওকে ধরে নিয়ে খাটে বসালো। রিস্টোর সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। দুর্গন্ধওয়ালা মলমেও খুব একটা কাজ হয়নি।

'তোকে ওরা ভীষণ মেরেছে রিস্টো?'

কোন কথা না বলে রিস্টো মাথা নেড়ে সায় জানালো।

'এখানে পাঠালো কেন?' নীল জানতে চাইলো, 'জেরা করা কি শেষ হয়েছে?'

'জেরা শেষ কিনা জানি না। একটু আগে কয়েকজন বন্দি এসেছে। ওদের ছুটোছুটি দেখে মনে হলো হোমরা চোমরা কেউ হবে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো দুই বন্ধু। বাইরে ঝড়ো বাতাসের তাণ্ডব বাড়ছে। ওদের দু'জনের বুকের ভেতর সেই ঝড়ের প্রতিধ্বনি। রিস্টো লক্ষ্য করেছে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট এই জেলখানাটা পুরোনো এক বার্চবনের ভেতর। অনেক গাছ আছে, একশ' সোয়াশ' বছরের পুরোনো। ছোটবেলায় আন্তন বুড়ো ওকে গাছ চেনাতেন। বলতেন, 'সবচেয়ে সহজে বয়স চেনা যায় বার্চ গাছের। যতদিন জোয়ান

থাকবে ততদিন গাছের বাকল থাকবে ধবধবে সাদা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকলে লাল ছোপ পড়বে। বুড়ো হলে কোথাও সাদার লেশমাত্র থাকবে না। ছোপ ছোপ কালো আর লালে মেশানো হবে বার্চের বাকল। তখনই বার্চ গাছ কাটতে হয়।'

নীল জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছিস রিস্টো?'

ম্লান হেসে রিস্টো বললো, 'কি আর ভাববো! বার্চ গাছ কতদিন বাঁচে তাই ভাবছিলাম।'

নীল অবাক হয়ে তাকালো রিস্টোর মুখের দিকে। রিস্টো মাঝে মাঝে এমন কথা বলে— মনে হয় ষাট পেরুনো কোনো বুড়ো কথা বলছে। রিস্টো বললো, 'এ জায়গাটা বার্চবনের ভেতর। অনেক আগে একবার এই বনে এসেছিলাম ইয়ং পাইওনিয়ারদের ক্যাম্পিং-এ।'

'তোর কি মনে হয় কেউ আমাদের চিরকুট পেয়েছে?'

'কী জানি, দুদিন তো হয়ে গেলো! সিটিযেন কমিটি খবর পেলে এতক্ষণে জেল ভেঙে নিয়ে যেতো। হতে পারে এখনো কেউ চিরকুট পায় নি।'

'সারাদেশে সিটিযেন কমিটির সমর্থক কী রকম?'

'লাখ তিনেকের মতো হবে।'

'তোর কি মনে হয় এরা আমাদের মেরে ফেলবে?'

'তোকে মারবে না। ঝামেলা হবে, সামলাতে পারবে না। আমাকে মেরে ফেলতে পারে। লাস লুকিয়ে ফেলবে। কে খবর পাবে!'

'এমন কথা বলিস না রিস্টো। আমরা এখান থেকে ঠিকই পালাবো!'

'কিভাবে?'

'সেটাই ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বের করতে হবে।'

'আমি একবার এক গোপন পত্রিকায় পড়েছিলাম, ঝিভকভের কোনও কোনও কারাগারে পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে আটক থাকা বন্দিও আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে ঝিভকভের পতনের আর বেশি দেরি নেই।'

'এরকম আন্দোলন আগেও কয়েকবার হয়েছে।'

'এবারের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। পোল্যাণ্ডের কথা চিন্তা কর। হাঙ্গেরি, চোকোশ্লোভাকিয়া, জিডিআর— সব জায়গাতে আন্দোলন হচ্ছে, সরকার বদল হচ্ছে।'

'ঝিভকভের প্রাণের বন্ধু রুমানিয়ার চসেস্কু কিন্তু বহাল তবিয়তে আছে।'

'কে জানে, ওখানেও হয়তো গোপনে কাজ হচ্ছে।'

'তোকে খুব আশাবাদী মনে হচ্ছে নীল।'

নীল মৃদু হেসে বললো, 'বাবা সব সময় বলেন, একমাত্র মানুষই আশা নিয়ে বাঁচে, সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।'

'আমরা তো সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যই লড়ছি।' স্বপ্নভরা গলায় বললো রিস্টো।

'আমার ভাই রবিন বলছিলো, বাংলাদেশের মানুষও একজন ডিক্টেটরকে হটাবার জন্য লড়ছে।'

'ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে যে যেখানে লড়ুক আমরা সবাই একে অপরের

কমরেড। তুই বাংলাদেশে লড়তে না পারলেও এখানে তো লড়ছিস।'

'বাবাকে বলেছি স্কুলের পাট শেষ হলে আমি বাংলাদেশে ফিরে যাবো।'

কারাগারে স্যাঁতসেঁতে প্রায় অন্ধকার কুঠুরিতে ষোল সতেরো বছরের দুই তরুণ এমন সব কথা বলছিলো, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদের বয়সের জন্য যা ছিলো একেবারেই বেমানান।

সারা সোফিয়া তোলপাড়

রিস্টো আর নীল যেদিন ধরা পড়লো তার পরদিন সারা সোফিয়ায় তোলপাড় কাণ্ড। দুপুরের পর সিটিযেন কমিটির জনসভায় অন্য সময় যে রকম হতো সেদিন দ্বিগুণ লোকের সমাবেশ হলো। সিটিযেন কমিটির পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে নীল আর রিস্টোর গ্রেফতারের সংবাদ বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ আর আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকার।

নীলের বাবা রাষ্ট্রদূত ইকবাল আহমেদ খান আগের রাতে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন ঝিভকভের পার্টির সদর দফতরে। কেন্দ্রীয় কমিটির যে নেতা সকালে দূতাবাসে এসেছিলেন, তাঁকে অফিসেই পাওয়া গেলো। রিস্টো আর নীলের গ্রেফতারের সংবাদ শুনে নেতা কয়েক জায়গায় টেলিফোন করলেন, তারপর দুঃখের সঙ্গে জানালেন, মাননীয় রাষ্টদূতকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে। পুলিশ, মিলিশিয়া সবাই বলছে এরকম কোনও ঘটনা ঘটে নি।'

হতাশ হয়ে পার্টির সদর দফতর থেকে বেরিয়ে এলেন নীলের বাবা। রবিন বললো, 'চাচা, আমার মনে হয় প্রফেসর ইয়াভরভ আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। তিনি আমেরিকান এ্যাম্বাসাডরের বাড়িতে আছেন। চলুন সেখানে যাই।'

'ঠিক বলেছিস।' নীলের বাবা বললেন, আমেরিকান এ্যাম্ব্যাসাডরের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। এবার তাঁকে সোফিয়ার সকল এ্যাম্বাসাডরের লিডার বানানো হয়েছে।'

নাইনথ সেপ্টেম্বর স্কয়ার থেকে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে আসতে তোবারক পঁচিশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট সময় নিলো। নীলের জন্য এ মুহূর্তে এটুকু ছাড়া ওর আর কিছু করার ছিলো না। তোবারক ভাবছিলো দরকার হলে নীলের জন্য জীবন দিতেও সে ইতস্তত করবে না। এই প্রথম অনুভব করলো নীলকে ও যতখানি ভালোবাসে, নিজের যদি কোনও ভাই থাকতো— এর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারতো

না। নীলের বিপদের কথা ভাবতে গিয়ে বার বার তোবারকের চোখে পানি জমছিলো।

ঠিক সোয়া দশটায় ওরা আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো। খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন প্রফেসর ইয়াভরভ। নীলের বাবাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'এক্সেলেন্সি, লিলিয়া আমাকে ফোনে সব বলেছে। খবরটা শোনার পর মনে হলো আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। শুনেছেন বোধহয় নীল কিভাবে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। ওর সঙ্গে আমার আদরের নাতি রিস্টোকেও ধরে নিয়ে গেছে নোংরা শয়তানের দল। আমি ওদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।'

প্রফেসরের কথা শেষ না হতেই আমেরিকার রাষ্ট্রদূত রবার্ট জ্যাকসন এসে ঘরে ঢুকলেন। নীলের বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত এক্সেলেন্সি। কালই আমি সোফিয়ার সমস্ত কূটনৈতিক মিশনের পক্ষ থেকে এদের ফরেন মিনিস্ট্রিকে কড়া নোট পাঠাবো। ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গেও কাল কথা বলবো। আপনি বিচলিত হবেন না, এদের আমরা ছেড়ে দেবো না।'

'একটু আগে আমি এদের পার্টির হেড কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। পুলিশ, মিলিশিয়া সবার সঙ্গে কথা বলে ওরা জানালো এ ধরনের কোন ঘটনাই নাকি আজ ঘটে নি।'

'ডাহা মিথ্যে কথা।' চড়া গলায় বললেন প্রফেসর ইয়াভরভ—' ঝিভকভের প্রশাসনকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। রিস্টোর মা লিলিয়া নিশ্চয় আমার সঙ্গে নিজের ছেলেকে নিয়ে ঠাট্টা করে নি। গ্রামের বহু লোক সাক্ষী আছে, দিনে দুপুরে পুলিশ আর মিলিশিয়া ওদের ধরে নিয়ে গেছে। এক্সেলেন্সি, আপনাকে ওরা সত্যি কথা বলে নি।'

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, কিভাবে ওদের খোঁজ পাবো?'

'আপনি আমাকে আজ রাতটুকু শুধু সময় দিন। ওপরের দিকের কয়েকজন জেনারেলকে আমি চিনি, এক সময় আমার দফতরে ওরা কাজ করতো। ওদের ভেতর ঝিভকভের বিরুদ্ধে কারা— তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে আগে। তারপর আমরা যা যা করার করবো।'

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বললেন, 'আমার মনে হয় খবরটা পত্রিকায় আসা দরকার। পত্রিকায় একবার সংবাদ বেরিয়ে গেলে ওরা আমাদের ছেলেদের কিছু করার আগে দুবার ভাববে। আমি এখনই পান্তেলেই মিযোভকে ফোন করছি— সিটিযেন কমিটির পত্রিকার সম্পাদক।'

পাশের ছোট টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ঘোরালেন রাষ্ট্রদূত জ্যাকসন। বললেন, 'হ্যালো মিযোভ, তোমাকে আমার জরুরি দরকার। গাড়ি পাঠাচ্ছি। তুমি একজন রিপোর্টারকে নিয়ে এখনই চলে এসো। কালকের জন্য একটা গরম খবর আছে।'

সকালে বুলগারাঙ্কা রোসা পত্রিকায় নীল তার রিস্টোকে মিলিশিয়ার অপহরণের সংবাদ পড়ে কিছুটা স্বস্তি পেলো বাড়ির সবাই। বাবা বললেন, 'খবরটা যেভাবে দিয়েছে, আমার মনে হয় না এরপর ওরা নীলদের কিছু করার সাহস পাবে।'

পুরো খবরটা সবাইকে বাংলায় অনুবাদ করে শুনিয়েছে তোবারক। ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায় সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। রবিনেরও একই অবস্থা। কেউ

ভালোমত নাশতা করতে পারলো না।

গতরাতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের বাসায় ঠিক হয়েছে সকালে দুই রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবেন। প্রফেসর ইয়াভরভ বললেন, 'আপনারা আপনাদের মত এগোন, আমি আমার মত এগুবো।' রবিন আর তোবারককে দেখিয়ে নীলের বাবাকে বললেন, 'আপনার অসুবিধে না হলে এই ছেলে দুটিকে আমি সঙ্গে নিয়ে বেরোবো। বাইরে একা ঘোরাফেরা করতে এখন ভয় করে।'

নীলের বাবা বললেন, 'কোন অসুবিধে হবে না। ইচ্ছে করলে আপনি আমার গাড়িও নিতে পারেন। আমি আমাদের কাউন্সিলারের গাড়ি ব্যবহার করবো।'

'না, এ গাড়ি লাগবে না।' মানা করলেন বুড়ো প্রফেসর। 'আমি এম্ব্যাসির সিডি গাড়িতে ঘুরতে চাই না। নম্বর প্লেট দেখলে গোয়েন্দাদের নজর পড়বে। আমি এদের একটা সাধারণ গাড়ি নিয়ে বেরোবো।'

সকালে রবিনরা আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের বাসায় এলো। দুই রাষ্ট্রদূত সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। প্রফেসর বললেন, 'আমাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দশটায়।'

রবিন বললো, 'আপনি কিভাবে এগুচ্ছেন বলতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমি জানতে আগ্রহী।'

'তোমাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করবো, নিশ্চয় জানবে তোমরা। আমার পুরোনো সহকর্মীদের ভেতর একমাত্র জেনারেল ভাসিলিনই আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়েছে। তার মানে ঝিভকভকে সে খুব একটা পরোয়া করে না। ওর সঙ্গে কথা বলে আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী তৈরি করবো। আগামী কাল সিটিযেন কমিটির জরুরি বৈঠক আছে। সেখানেও আমি এ বিষয়ে কথা বলবো।'

তোবারক বললো, 'স্যার, যে গ্রাম থেকে মিলিশিয়া ওদের গ্রেফতার করেছে, একবার সেখানে গিয়ে দেখলে হয় না?'

'সেখানে আর কী দেখবে?' প্রফেসর বললেন, 'গ্রামের লোক লিলিয়াদের যা বলেছে তোমাদেরও তাই বলবে। ওদের কেউ তো বলতে পারবে না নীলদের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে!'

প্রফেসর ওদের বসতে বলে ভেতরে গেলেন পোষাক বদলাতে। তোবারক বললো, 'রবিন তোমার কি মনে হয়, রিস্টোর গ্রামের বাড়িতে গেলে কিছু খবর মিলতে ফারে?'

'কথাটা আমারও মনে হয়েছে তোবারক। প্রফেসরকে সব কথা বলার কি দরকার। আমরা আমাদের মত নীলদের খুঁজবো। দরকার হলে তাঁর সাহায্য অবশ্যই নেবো।'

সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে হাড়কাপানো সাইবেরিয়ান বাতাস বইছে। তোবারক রেডিওর খবরে শুনেছে পশ্চিমের আড্রিয়াটিক সাগর থেকে ঝড় আসছে। আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতর বুলগেরিয়ার ওপর আঘাত করবে। বলকানে এখন ঝড়ের সময়।

প্রফেসর ঘর থেকে বেরোলেন ওভারকোট পরে। গলায় মাফলার, মাথায় টুপি। সামান্য হেসে বললেন, 'তোমাদের মত ছোকরা তো নই, একটা জ্যাকেট দিয়ে শীত মানাতে পারবো। চলো বাছারা, বেরোনো যাক।'

শিপকা স্ট্রিট-এ জেনারেল ভাসিলিনের বাড়ি। আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, গত বছর থেকে অবসর জীবন যাপন করছেন। অবসর নিলেও প্রফেসর ইয়াভরভ ভালো করেই জানেন এখনও জেনারেল যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এক ছেলে সোফিয়া প্রেস এজেন্সির পরিচালক, আরেক ছেলে স্পেনে রাষ্ট্রদূত।

প্রফেসর ইয়াভরভকে দেখে বলকানি কায়দায় কোলাকুলি করে গালে চুমো খেলেন জেনারেল ভাসিলিন। রবিন আর তোবারকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সবাইকে নিয়ে ড্রইংরুমে বসলেন। প্রফেসরকে বললেন, 'কি নেবে, চা, কফি না ভদকা, কনিয়াক?'

'আমাকে ভদকা দাও।' প্রফেসর বললেন 'ছেলে দুটো মনে হয় কফি পছন্দ করবে। বেশ শীত পড়েছে।'

ছোট একটা হাতঘন্টা বাজিয়ে জেনারেল কাজের লোককে ডেকে কফি আর ভদকা দিতে বললেন। তারপর প্রফেসর ইয়াভরভকে বললেন, 'দুটো ছেলে হারিয়ে না গেলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ফোন করতে না। দশ বছর আগে একবার লুকিয়ে এসেছিলে। আমার সঙ্গে দেখা করো নি। পুরোনো বন্ধুকে তুমি ভুলে গেছো ইয়াভরভ।'

জেনারেলের এসব মনরাখা অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ছেলে দুটো হারিয়ে যায় নি ভাসিলিন। মিলিশিয়া ওদের এ্যারেস্ট করেছে। গ্রামের বহু মানুষের চোখের সামনে দিয়ে ওরা ছেলে দুটোকে নিয়ে গেছে।'

'কথাটা কালও তুমি বলেছো ইয়াভরভ। আমি সকালে তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, পুলিশ আর মিলিশিয়ার চীফের সঙ্গেও কথা বলেছি। বুলগারাঙ্কা রোসার খবর ওরা সবাই দেখেছে। একজন রাষ্ট্রদূতের ছেলে নিখোঁজ হওয়া যা-তা ব্যাপার নয়। ওরা কয়েকটা সার্চ পার্টি নামিয়েছে। বলেছে আজ সন্ধ্যার ভেতরই ওরা ছেলে দুটোকে খুঁজে বের করবে।'

'জেনারেল নিকোলাই ভাসিলিন!' ঠান্ডা গলায় কেটে কেটে বললেন প্রফেসর, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে, নাকি ঝিভকভের প্রশাসন সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না?'

'এভাবে কথা বলছো কেন ইয়াভরভ? আমি আন্তরিকভাবেই তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমরা অনেকে যা পারি নি তুমি তা পেরেছো। সেজন্য তোমাকে আমরা ভালোবাসি। শ্রদ্ধাও করি।'

ওঁরা বুলগেরিয়ান ভাষায় কথা বলছিলেন, যার একবর্ণও রবিনের বোধগম্য হচ্ছিলো না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় তোবারক সব কথা রবিনকে দাড়ি কমা সহ বলেছে। বলা বাহুল্য তোবারকের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির প্রশংসা না করে পারে নি রবিন। এ মুহূর্তে ও একজন অসহায় দর্শক মাত্র।

জেনারেলের নরম কথায় আরো রেগে ইয়াভরভ—'নিকুচি করি তোমাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার! তোমার কি মনে হয় ঝিভকভের গুপ্ত পুলিশ আর গোয়েন্দা বাহিনী সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই? ওরা যে যখন তখন যাকে তাকে ধরে লোপাট করে দিতে পারে সে সম্পর্কে তুমি কি কিছুই জানো না?'

'তুমি অযথা উত্তেজিত হচ্ছো ইয়াভরভ। একবার বললে পুলিশ আর মিলিশিয়া

ধরেছে, আরেকবার বলছো গুপ্ত পুলিশ আর গোয়েন্দার কথা, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ঠিক মত বলো তো ওদের কারা ধরেছে?'

'মোটা মাথাটা একটু ঘামাও ভাসিলিন। পুলিশ আর মিলিশিয়া ওদের ধরে নিয়ে গেছে এটা হচ্ছে গ্রামের মানুষদের কথা। ধরে নিচ্ছি তোমাদের পুলিশ আর মিলিশিয়ারা স্বর্গের দেবদূতের মত পবিত্র হয়ে গেছে, সবাই সত্যি কথা বলছে। তাই যদি হয় সেক্ষেত্রে গোয়েন্দা পুলিশের কথা অবশ্যই আমাদের হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। তুমি তো ভালো করেই জানো ওরা ওদের কাজের জন্য ঝিভকভের সেক্রেটারিয়েট ছাড়া কারো কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দেয় না। সাধারণ পুলিশ বা মিলিশিয়া না ধরলে ছেলে দুটোকে গোয়েন্দা পুলিশ ধরেছে, এতে না বোঝার কি আছে?'

'তুমি কি তাহলে গুপ্ত পুলিশের চীফের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে বলছো?'

'বলে দেখতে পারো। অন্যরা যে জবাব দিয়েছে অফিসিয়ালি ভেলকভ তোমাকে সেই জবাবই দেবে। গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দা লাগাও। গুপ্ত পুলিশের ওপর দিকে আমাদের লোক কারা আছে খুঁজে বের করো। জেনারেল চোলপানভের সঙ্গে কথা বলো। অনেকে ভাবছে ঝিভকভকে এবারও গদি থেকে হটানো যাবে না, তাই শামুকের মত খোলসের ভেতর মাথা লুকিয়ে রেখেছে। ওদের বলো ঝিভকভের পতন মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। হপ্তাও নয়— দিন, বুঝেছো? যারা ভদ্র শামুক হয়ে থাকতে চাইবে— টেরও পাবে না কখন ওদের সেদ্ধ করে লোকেরা পেটের ভেতর চালান করে দিয়েছে।'

'আমাকে একটু সময় দাও ইয়াভরভ। গুপ্ত পুলিশ বিভাগ ঝিভকভের একেবারে হাতের মুঠোয়। ওখানে থাবা মারতে হলে আটঘাট বেঁধে নামতে হবে।'

'তোমাকে আমি আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি ভাসিলিন। পরশু ঠিক এ সময় আমি আসবো। তখন যেন ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি। আর যদি ওদের কারো কিছু হয় ভেলকভ আর ঝিভকভ—এ দুটোকে পাহাড়ী নেকড়ে দিয়ে খাওয়াবো।'

এরপর প্রফেসর ইয়াভরভ আর জেনারেল ভাসিলিন পার্টি আর সিটিযেন কমিটির ভেতরের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। সেসব শোনার ব্যাপারে তোবারকের আগ্রহ না থাকার কারণে রবিনকেও কিছু বলতে পারে নি। অবশ্য সে সময় রবিনেরও এসব কথা শোনার উৎসাহ ছিলো না।

দুপুরে রবিন আর তোবারক খাওয়ার জন্য বাড়ি ফিরতে পারে নি। প্রফেসরের সঙ্গে হোটেলে খেয়েছে। বাড়িতে অবশ্য ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলো রবিন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের নিয়ে প্রফেসর অনেকগুলো জায়গায় ঘুরলেন। সবখানে একই কথা—সার্চ পার্টি নামানো হয়েছে। সব শেষে বুলগারাঙ্কা রোসার অফিসে গিয়ে সম্পাদক পান্তেলেই মিযোভকে বললেন, 'কালকের পত্রিকায় ছেলে দুটোর খবরের একটা ফলো আপ ছেপে দিও। শয়তানের দল বলছে সার্চ পার্টি নাকি নামানো হয়েছে। যত সব বদমাইশি। ভালো মত একটা ধোলাই দাও। যা দেখছি এরপর কবে শুনবো মার কোল থেকে বাচ্চা নিয়ে যেতেও এরা ইতস্তত করছে না।'

সম্পাদক মিযোভ বললেন, 'আমাদের ছেলেরাও বিভিন্ন সোর্সে খবর নিচ্ছে। রিস্টো আর নীলকে যতদিন পাওয়া না যাবে ততদিনই ফলো আপ নিউজ যাবে। এ নিয়ে

ভাববেন না প্রফেসর ইয়াভরভ। আপনি কি আমাদের লেখাটা তৈরি করতে পেরেছিলেন?'

কোটের পকেট থেকে এলোমেলো কয়েক শিট হাতে লেখা কাগজ বের করে সম্পাদককে দিলেন প্রফেসর— 'মন মেজাজ ভালো নেই, লেখাটা ঠিক জমে নি। ভার্না থেকে ফিরে তোমাকে একটা কড়া লেখা দেবো।'

বুলগরাঙ্কা রোসার অফিস থেকে ওরা যখন বের হলো ঘড়িতে তখন ছটা বাজলেও বেশ রাত মনে হচ্ছিলো। খারাপ আবহাওয়ার জন্য রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা বাতাস। তোবারকের এ ধরনের ঠান্ডা সহ্য হলেও রবিনের মনে হচ্ছিলো কিছুক্ষণ বাইরে থাকলে জমে বরফ হয়ে যাবে।

প্রফেসরকে পথে তাঁর জায়গায় নামিয়ে দিয়ে রবিনরা বাড়ি ফিরলো সাড়ে ছটা নাগাদ। নীলের বাবা একটু আগে ফিরেছেন। জেনারেল ভাসিলিনের সঙ্গে প্রফেসরের কী কথা হয়েছে তোবারক গাড়িতে আসার সময়ই রবিনকে বলেছিলো। একই কথা বাড়ির সবাইকে আবার বললো। নীলের বাবা বললেন, 'জেনারেল ভাসিলিন যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু তোবারক, তুমি কি ঠিক মত ওদের কথা ফলো করতে পেরেছিলে? প্রফেসর কি সত্যি সত্যি জেনারেলকে এ রকম ধমক দিয়ে কথা বলেছেন?'

রবিন বললো, 'একটু আগে তোবারক ঠিক এভাবেই কথাগুলো আমাকে বলেছে। প্রফেসর যে জেনারেলকে ধমক দিচ্ছিলেন সেটা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। লক্ষ্য করো নি তোবারক, ধমক খেয়ে জেনারেল কেমন কাচুমাচু করছিলেন? প্রফেসর তো বললেন জেনারেল ভাসিলিন তাঁর আন্ডারে কাজ করেছেন।'

নীলের মা বাবাকে বললেন, 'তুমি তো ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবে বলেছিলে। দেখা হয়েছে?'

'দেখা হবে না কেন! আমেরিকান এ্যাম্বাসাডর এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন। মিনিস্টারও একই কথা বলেছেন। নাকি তিনটা সার্চ পার্টি খুঁজছে নীলদের। এ আরেক ডিগ্রি ঘড়েল। বললো, তারা নাকি সন্দেহ করছে এটা বুলগেরিয়ান তুর্কীদের কাজ। সরকারের সঙ্গে বন্দি বিনিময়ের জন্য ওদের ধরেছে।'

'বলো নি, গ্রামের লোকেরা দেখেছে পুলিশ আর মিলিশিয়াকে?'

'বলেছি। পাজিটা বলে কিনা ওরা পুলিশ আর মিলিশিয়ার পোষাক পরে গিয়েছিলো। আমাদের অনুরোধ করেছে দুদিন সময় দিতে।'

রবিন বললো, 'প্রফেসরও জেনারেলকে দুদিন সময় দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে, কালকের দিনটা দেখা যাক।'

'চাচা, আমি আর তোবারক ঠিক করেছি কাল রিস্টোদের গ্রামের বাড়িতে যাবো।'

'তোরা চিনিস?'

'চিনবো না ক্যান।' তোবারক বললো, 'নীল বাই যেখানে যায় আমারে বলে যায়।'

'ঠিক আছে, দেখো কোনো ক্লু পাওয়া যায় কি না। প্রফেসরকে বলেছো তোমরা যে ওখানে যাবে?'

'বইলছিলাম। প্রফেসর অবশ্য খুব আশাবাদী নন। কাল সকালে তিনি ভার্না যাচ্ছেন, রাতে ফিরবেন।'

'যা ভালো বোঝ করো।' নীলের বাবা তখন অন্য কিছু ভাবছিলেন।

রাতে সবাই ঘুমোতে যাবার পরে রবিন আর তোবারক জেগেছিলো অনেকক্ষণ। তোবারকের শোয়ার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে নীলের কথাই আলোচনা করছিলো ওরা। বাইরে তখন বার্চ, ওক আর লিন্ডেন গাছের ভেতর ঝড়ো হাওয়ার মাতম চলছে।

রবিন আর তোবারকের অভিযান

পরদিন সকালে বেরোবার আগে রবিন আর তোবারককে এমনভাবে সাজগোজ করতে হলো— যেন চট করে ওদের চেনা না যায়। তোবারকের জামা কাপড় সব ওর বাড়িতে, রবিনের পোষাকই পরতে হলো ওকে। রবিন ইটালিয়ান স্যুট পরলো, তোবারক ব্লু জিনস-এর প্যান্টের সঙ্গে পরলো হালকা বাদামী রঙের মোটা পুলওভার। রবিনের বাবা গত বছর প্যারিস থেকে এনেছিলেন ওটা। প্যান্টের সঙ্গে ম্যাচ করা টুপি আর মাফলার পরলো। দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছিলো গ্রীক অথবা ইটালিয়ান টুরিস্ট।

বাসে করেই ওরা বয়ানা এলো। আকাশ মেঘলা থাকলেও বাতাস তেমন ছিলো না। সারাটা পথ রবিনকে মনে হচ্ছিলো একজন বিদেশী টুরিস্ট আর তোবারক ওর বুলগেরিয়ান গাইড—কথা বলছিলো ইংরেজিতে। সোফিয়ায় টুরিস্ট সিজন তখনো শেষ হয় নি। বাসে আরও কয়েকজন টুরিস্ট দেখতে পেলো ওরা, যাদের সঙ্গে ওদের মত বুলগেরিয়ান দোভাষী আর গাইড ছিলো।

নীল যাওয়ার সময় তোবারককে আন্তনের রেস্টুরেন্টের কথা বলে গিয়েছিলো। জাদুঘরের পাশে একটাই রেস্টুরেন্ট, খুঁজতে ওদের সময় লাগলো না। তবে হতাশ হলো ওরা, যখন শুনলো আন্তন নেই। কখন আসবে কাউন্টারের লোকটা কিছুই বলতে পারলো না। মন খারাপ করে যখন ওরা বেরিয়ে আসবে তখন ভেতর থেকে— 'আন্তনের কথা কে জিজ্ঞেস করে?' বলতে বলতে একজন মাঝবয়সী মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এলেন।

তোবারক এগিয়ে গিয়ে বললো, 'রিস্টোর বন্ধু নীলের ভাই আমরা। ওদের খোঁজে এসেছি।'

উত্তেজিত গলায় মহিলা বললেন, 'আরে সে কথা বলবে তো! আন্তন তো একটু

আগে রিস্টোর মামা বাড়িতেই গেলো। কী নাকি চিঠি পাঠিয়েছে রিস্টো, এক ছোকরা এসে আস্তনকে ডেকে নিয়ে গেছে।'

'বাড়িটা কোথায় মাদাম, দয়া করে বলবেন কি?' জানতে চাইলো তোবারক।

'এক মিনিট বাছা।' গলা তুলে মহিলা ডাকলেন, কালিন, এদিকে একটু শুনে যা তো!'

বারো তেরো বছরের চটপটে একটা ছেলে হাত মুছতে মুছতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। মহিলা বললেন, 'তোর আস্তন খুড়ো গেছে রিস্টোর মামা বাড়ি। এদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

'চলুন যাই।' এই বলে হাসিমুখে ছেলেটা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো! পথে যেতে মোড়ের কাছে কয়েকজন লোকের জটলা দেখতে পেলো ওরা। জেরার ভঙ্গিতে একজন জানতে চাইলো— 'তোর সঙ্গে ওরা কারা যাচ্ছে কালিন?'

কালিন জবাব দিলো—'আস্তন খুড়োর অতিথি।'

আরো এক জায়গায় কালিনকে কথা বলতে হলো।

তোবারক জানতে চাইলো 'এদিকে চোর ডাকাতের উৎপাত বেশি নাকি! অচেনা লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করছে?'

কালিন বললো, 'দু দিন আগে পুলিশ এসে ঘেরাও দিয়ে রিস্টো আর ওর বন্ধুকে ধরে নিয়ে গেলো না! গ্রামের সবাই ঠিক করেছে পুলিশ, মিলিশিয়া যেই গ্রামে ঢুকুক, পিটিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে।'

কালিনের কথাগুলো রবিনকে তর্জমা করে শোনালো তোবারক। গ্রামের মানুষের এই সচেতনতা ভালো লাগলো রবিনের। ভাবলো, কবে বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ এভাবে রুখে দাঁড়াবে!

বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তে বুড়ো আস্তন এসে দরজা খুললেন। কালিন বললো, 'আস্তন খুড়ো, এরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'ভেতরে আসুন।' বলে ওদের নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন আস্তন।

তোবারক বললো, 'আমরা নীলের ভাই। জানতে এসেছি কিভাবে ও ধরা পড়লো।'

'ভালো হয়েছে আপনারা এসেছেন।' উত্তেজিত গলায় আস্তন বললেন, 'নইলে আজই আমি নীলের বাবার সঙ্গে দেখা করতাম। জানেন একটু আগে ইতিমান থেকে এক স্কুল মাস্টার এসেছিলো। রিস্টোর লেখা একটা চিরকুট কুড়িয়ে পেয়েছে ও। ভেতরে চলুন, দেখাচ্ছি।'

সিটিযেন কমিটির ইশতেহারের উল্টো দিকে লেখা রিস্টোর ছোট চিঠি পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলো তোবারক। রবিনকে বললো ওতে কী লেখা আছে।

চাপা উত্তেজিত গলায় রবিন জানতে চাইলো, 'ঠিক কোন জায়গায় পাওয়া গেছে এটা?'

'মাস্টার বললো ইতিমান স্কুলের পাঁচিলের গায়ে। হাইওয়ের ওপর পড়েছে স্কুলটা। প্লভদিভ হয়ে রাস্তাটা ইস্তাম্বুল চলে গেছে।'

'প্লভদিভ আর ইতিমানের মাঝামাঝি আর কোন লোকালয় আছে এ রাস্তার ওপর?'

'ছোট একটা লোকালয় আছে লেসতাহান-এ।'

'এখন থেকে ইতিমান কত দূর?'

'একশ কিলোমিটারের মত হবে।'

'সেখান থেকে প্লভদিভ কতদূর?'

'তা ধরুন আরো চল্লিশ কিলোমিটার।'

রবিনের দোভাষী হয়ে কাজ করছিলো তোবারক। এবার ও নিজে বললো, 'মনে হয় হাইওয়েতে খুঁজলে এ রকম আরো চিঠি পাওয়া যাবে।'

আন্তন বললেন, 'মাস্টার এটা দিয়ে চলে গেছে। ওদের স্কুলের ছেলে মেয়েদের বলবে এরকম ভাঁজ করা ইশতেহার আরো পায় কিনা খুঁজে দেখতে। পেলে আমাদের জানাবে।'

'শুধু ওরা খুঁজবে কেন? আমরাও তো খুঁজতে পারি।'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'এক কাজ করা যাক। আমরা একটা গাড়ি নিয়ে ফিরে আসছি। আন্তন খুড়ো আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

'কেন যাবো না বাছা! খুড়ো বলে ডেকেছো তার ওপর আমাদের রিস্টোর বন্ধুর ভাই। একবার কেন দরকার হলে একশবার যাবো।'

'ঠিক আছে, এগারোটার মধ্যে আমরা আসবো।' কথা না বাড়িয়ে তোবারক রবিনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলো শহরের দিকে।

বাসে যেতে যেতে রবিন বললো, 'এম্ব্যাসির গাড়ি দেখলে পেছনে গোয়েন্দা লাগবে না?'

'না, আমরা সিডি কার নিব না। কাউন্সিলার সাহেবের গাড়ি অর্ডিনারি নম্বরের। ওই গড়িতে আমরা প্লভদিভ পইর্যন্ত যাব।'

আকাশের অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে। স্লেটের মত কালো ছেঁড়া মেঘ ইতস্তত ভাসছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে। রাস্তার দু'পাশে বার্চ আর লিন্ডেন গাছগুলো প্রায় ন্যাড়া হয়ে গেছে। বাসে যাত্রী কম ছিলো। রাস্তা ফাঁকা দেখে ড্রাইভার স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক বেশি জোরে চালাচ্ছিলো। বয়ানা থেকে একষট্টি নম্বর বাস মিহালভ ষ্ট্রিটের এ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টপেজ পর্যন্ত যায়। ওখানে নেমে একটা ট্যাক্সি নিলো রবিনরা। রাকৌস্কি ষ্ট্রিটে দূতাবাসে আসতে সব মিলিয়ে ওদের পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগলো।

দূতাবাসে গত সাত বছরের চাকরি জীবনে তোবারক প্রথমবার একটা নিয়ম ভাঙলো। রবিনকে নিয়ে রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারির কাছে না গিয়ে সোজা তাঁর ঘরে চলে গেলো।

নীলের বাবা মন খারাপ করে একা বসেছিলেন। রবিন বললো, 'চাচা, নীলদের একটা খবর পাওয়া গেছে।'

তোবারক রিস্টোর লেখা চিঠি পড়ে শোনালো। নীলের বাবা আপন মনে বললেন, 'রিস্টো লিখেছে ওদের মিলিশিয়া ধরেছে।'

রবিন বললো, 'রিস্টোও পোষাক দেখে ভুল করতে পারে। যেই ধরুক, আমি আর তোবারক এখনই কাউন্সিলার সাহেবের গাড়ি নিয়ে প্লভদিভ যেতে চাই।'

তোবারক বললো, 'বুড়া আন্তনও সঙ্গে যাইবে।'

কেন প্লভদিভ যাবে, আন্তন কে— কিছুই জানতে চাইলেন না নীলের বাবা। ইন্টারকমে কাউন্সিলারের গাড়িটা ধার চাইলেন সারাদিনের জন্য। তারপর তোবারককে শুধু বললেন, 'গাড়ি নিয়ে যাও। রবিনের সব ভার তোমার।'

'আল্লা ভরসা, আপনি ঘাবড়াইবেন না স্যার।' এই বলে তোবারক রবিনের হাত ধরে রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সেক্রেটারি ইলিনা ওদের দেখতে পেয়ে তোবারককে ডেকে বুলগেরিয়ান ভাষায় কী যেন বললো। তোবারক ওর কথার জবাব না দিয়ে একবারে দুই তিন সিড়ি টপকে নিচে নামলো। কাউন্সিলারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মুহূর্তের ভেতর বেরিয়ে এলো দূতাবাস থেকে।

শহরের ভেতর তোবারক একটু আস্তে চালিয়েছিলো গাড়ি। শহর থেকে বেরিয়ে সত্তর মাইল স্পীড তুললো। মাঝে মাঝে রাস্তা ভেজা না থাকলে আরও স্পীড তুলতে পারতো।

রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'এম্ব্যাসির ঐ মহিলা তখন তোমাকে কী বলছিলো তোবারক?'

'কে ইলিনা? জিজ্ঞাসা করছিলো নীলের কোনো খবর ফাওয়া গেছে কিনা। এই বেটি দেখতে সোন্দর হইলে কী হইবে, মতলব ভালো না।'

'কেন কি করেছে?'

'নানা উল্টাফাল্টা কথা কয়! বড় অসভ্য বেটি। আমি কই, তোর এত জানার কী দরকার, স্যারের বাসায় কখন কে আসে এসব খবরের?'

'তোমাকে বুঝি এসব জিজ্ঞেস করে?'

'আর কারে জিজ্ঞাসা কইরবো? ফাইছে তো এক আমারে।'

'তুমি চাচাকে বলো নি এসব?'

'নীল বাইরে কইছি। এতদিন কাউরে কিছু বলি নাই। ভাবতেছি স্যাররেও বলা দরকার।'

তোবারক যে স্পীডে গাড়ি চালিয়েছে তাতে ওরা আধ ঘন্টার ভেতর বয়ানা পৌছে গেলো। আন্তন আন্তনভ এগিয়ে এসে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়েছিলেন। তোবারক খেয়াল করে নি। রবিন ওঁর হাত নাড়ানো দেখে তোবারককে বললো, 'গাড়ি থামাও, আন্তন খুড়ো বাস স্টপেজে অপেক্ষা করছেন।'

তোবারক গাড়ি থামাতেই ছুটে এলেন আন্তন—'তাড়াতাড়ি এসে গেছো দেখছি। একটু আগে আর্মির একটা কনভয় যেতে দেখলাম প্লভদিভের রাস্তায়।'

রবিন পেছনের দরজা খুলে দিতেই আন্তন উঠে বসলেন। তোবারক আন্তনকে বললো, 'যদিও দুদিন হয়ে গেছে, আমরা একটা ভাঁজ করা ইশতেহার খুঁজবো রাস্তার দুপাশে। ঝোপের ভেতর, ঘসের ভেতর কিম্বা ড্রেনের ভেতর, যে কোন জায়গা পড়ে

থাকতে পারে।' রবিনকেও ওর নিজস্ব বাংলায় এ কথাগুলো বললো।

সামনে সতর্ক চোখ রেখে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলো তোবারক। রবিন আর আন্তন দুপাশের জানালা দিয়ে খুঁজতে লাগলো রিস্টোর ইশতেহার। নেহাৎ হাইওয়ে বলে এমন দৃশ্য কারো চোখে পড়লো না। কচ্ছপের মত আস্তে আস্তে চলছে গাড়ি, দু পাশের জানালা দিয়ে কচ্ছপের মত মাথা বের করে রেখেছে দু'জন— এমন দৃশ্য লোকালয়ে দেখা গেলে ভিড় জমে যেতো।'

রাস্তায় রিস্টোর লেখাওয়ালা দ্বিতীয় ইশতেহারটা পেতে ওদের ছত্রিশ মিনিট সময় লাগলো। এর ভেতর সাত আটবার কাগজের টুকরো দেখে গাড়ি থামিয়েছে তোবারক। কোনটা এমনি সাদা কাগজে, কোনটা সরকারি কোন প্রচার পত্র। একটাতে দেখলো দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। পড়ে তোবারকের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।

রিস্টোর ইশতেহারটা পেলো একটা বার্চ গাছের তলায়, পুরোটাই ঘাসের ভেতর, একটু কোণা শুধু বেরিয়েছিলো। তোবারক গাড়ি নামাতে রবিন বললো, 'দেখ এটা আবার কোন সরকারি নির্দেশ!'

'ফাইছি!' কাগজের ভাঁজ খুলে চিৎকার করে উঠলো তোবারক। ওর খেয়ালই নেই সঙ্গে যে আন্তন রয়েছেন।

'দেখি।' ওটা ছিনিয়ে নিলো রবিন।

'একই জিনিস।' উত্তেজিত গলায় বললো তোবারক, 'সিটিযেন কমিটির লিফলেটের উল্টা দিকে রিস্টোর লেখা।'

আন্তন বললেন, 'এতে প্রমাণ হচ্ছে রিস্টোরা অনেকগুলো ইশতেহার ফেলেছে। আমার মনে হয় ইতিমান পর্যন্ত আমরা ইশতেহার না খুঁজেই যেতে পারি। কারণ প্রথমটা ওখানে পাওয়া গেছে।'

তোবারক বললো, 'আপনি ঠিক বলেছেন আন্তন খুড়ো। ইতিমান থেকে প্লভদিভ পর্যন্ত ভালোভাবে খুঁজতে হবে।'

রবিন আর আন্তন গাড়িতে ওঠার পর ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালালো তোবারক। রবিন বললো, একটা কথা ভেবে দেখেছো তোবারক! রিস্টোর ইশতেহার যেভাবে আমাদের হাতে এসেছে, সরকারি গোয়েন্দাদের হাতেও তো সেভাবে পড়তে পারে। ওরা যদি নীলদের অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে ফেলে?'

'হ্যাঁ, ভাবনার কথা রবিন।' গম্ভীর হয়ে রবিনের আশঙ্কার কথা বুলগেরিয়ান ভাষায় আন্তনকে তর্জমা করে শোনালো তোবারক।

আন্তন বললেন, 'সরকারী গোয়েন্দারা এখন সোফিয়ার গোলমাল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের মত শহরের বাইরে ইশতেহার খোঁজার সময় কোথায় ওদের!'

আন্তনের কথা তোবারক আর রবিনকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারলো না।

বাইরে ঝড়ো বাতাসের দাপট ধীরে ধীরে বাড়ছে। আকাশের রঙ আরো কালো হয়ে এসেছে। তোবারক নিচু ভলিউমে গাড়ির রেডিও অন করে রেখেছিলো। আবহাওয়ার জরুরি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বললো, পশ্চিমের আড্রিয়াটিক সাগর থেকে উঠে

আসা নিম্নচাপ আজ রাতে সোফিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে ঘন্টায় একশ থেকে দেড়শ কিলোমিটার বেগে। রবিনকে খবরটা জানালো তোবারক।

রবিন বললো, 'পশ্চিম থেকে শুধু প্রাকৃতিক ঝড়ই আসে না তোবারক, রাজনৈতিক ঝড়ও আসে।'

'তার মানে?' রবিনের কথাটা বুঝতে চাইলো তোবারক।

রবিন বললো, 'বুলগেরিয়ায় এই যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শুধু বুলগেরিয়ায় কেন—হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, জিডিআর সবখানে—পশ্চিমা হাওয়ার ইন্ধন না পেলে একসঙ্গে এত জায়গায় গোলমাল হতো বলে আমার মনে হয় না। ধনতন্ত্রটা পশ্চিমাদের মতবাদ। পুবের এরা মেঘ চেয়েছে, মেঘ এসেছে। ধনতন্ত্রের এই কালো মেঘ এদের অনেক ভালো জিনিসও ধ্বংস করে দেবে।'

'তুমি কি বইলতে চাও, ঝিভকভের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন করাটা ঠিক না?' প্রশ্ন করলো তোবারক।

'ঝিভকভের দুর্নীতি আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এরা ঝিভকভকে সরাতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকেই সরিয়ে দিতে চাইছে; আন্তনকে জিজ্ঞেস কর তো আমার ধারণা ঠিক কিনা?'

তোবারকের কাছে রবিনের কথা শুনে আন্তন বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছো রবিন। ঝিভকভের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলেও এখন সেটা সমাজতন্ত্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। আমি এখনো পার্টির সদস্য। আমার মত অনেকে চায় ঝিভকভের বদলে পার্টিতে নেতৃত্ব বদলের একটা সুযোগ থাকুক। সৎ আর যোগ্য যারা তারা নেতৃত্বে আসুক। আমি চাই বুলগেরিয়ায় সমাজতন্ত্র থাকুক। আমাদের কাজের, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা আর ছেলেমেয়ের পড়ার গ্যারান্টি থাকুক। সমাজতন্ত্রই পারে এসবের গ্যারান্টি দিতে। কিন্তু ভয় হচ্ছে যদি পোল্যাণ্ডের মত ভিন্নমতের লোকেরা এখানে ক্ষমতায় আসে, সমাজতন্ত্র যদি বাতিল করে দেয়, তখন গরিব মানুষ আরও গরিব হবে।'

রবিন বললো, 'আপনার কি মনে হয় বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্ব বদলের কোনো সম্ভাবনা আছে?'

'কাল রাত থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি বৈঠক চলছে। আমার তো মনে হয় আজ না হয় আগামীকালের মধ্যেই পার্টি নেতৃত্বে বড় রকমের রদবদল হবে। সিটিযেন কমিটির আন্দোলন আমাদের সমর্থন ছাড়া কখনো এতটা শক্তিশালী হতে পারতো না।'

'আপনারা কেন সিটিযেন কমিটিকে সমর্থন করলেন? ওরা তো সমাজতন্ত্র চায় না।'

'ওদের সমর্থন ছাড়া ঝিভকভকে হটানো যাবে না। ঝিভকভ যতদিন থাকবে ততদিন এসব দুর্নীতি আর অত্যাচারও দেশ থেকে যাবে না।'

'প্রফেসর ইয়াভরভ কি আপনাদের মত সমর্থন করেন?'

'আগে করতেন। এখন তিনি মনে করেন সমাজতন্ত্র এসব দেশে আর চলবে না।

সিটিযেন কমিটির একটা বড় অংশ পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তবে রিস্টোর বাবা মনে করেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা রেখেও বহুদলীয় গণতন্ত্র হতে পারে। গণতন্ত্র মানে কথা বলা আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি হয়। রিস্টোর বাবা গিয়র্গির সঙ্গে এ নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়েছে। আমরা বলেছি গণতন্ত্র চাও ভালো কথা, এত বছর ধরে সমাজতন্ত্রের যে সুফল আমরা ভোগ করেছি সে সব কেড়ে নেয়া চলবে না।'

বাতাসের তেজ দেখে তোবারক গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছিলো। পেছনে মিলিশিয়ার গাড়ির হর্ণ শুনে ও সাইড দিলো। ওদের ওভারটেক করে চলে গেলো মিলিশিয়ার একটা জিপ আর প্রিজন ভ্যান। তোবারক বললো, 'মনে হয় বড় কোন নেতা এ্যারেস্ট হয়েছে।'

আন্তন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোবারক, মিলিশিয়ার গাড়িটাকে ফলো করো। এরকম গাড়িতে করেই নীল আর রিস্টোকে নেয়া হয়েছিলো। আমার মনে হচ্ছে ওদের যেখানে রাখা হয়েছে এই বন্দিদেরও সেখানে নেয়া হচ্ছে।'

'আপনি ঠিক বলেছেন আন্তন খুড়ো।' এই বলে তোবারক ওর গাড়ির স্পীড বাড়ালো। শুধু জিপ হলে মিলিশিয়ারা বুঝে ফেলতো ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে, মাঝখানে চারদিক ঢাকা ভ্যান থাকাতে ওরা কিছু টের পেলো না।

তোবারকরা ভেবেছিলো মিলিশিয়ার ভ্যান প্লভদিভ পর্যন্ত যাবে। যে স্পীডে যাচ্ছে প্লভদিভ পৌছতে আরো ঘন্টা খানেক লাগার কথা। ঘড়িতে তখন দুপুর বারোটা। অবশ্য আকাশের অবস্থা দেখে তখন মনে হচ্ছিলো সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ইতিমান পেরিয়ে লেসতাহানের কাছে এসে মিলিশিয়ার গাড়ি হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ দিকে কাঁচা রাস্তায় মোড় নিলো। তোবারক অবাক হয়ে বললো, 'এরা তো প্লভদিভ যাইতেছে না!'

আন্তন বললেন, 'বুঝেছি। তুমি এদের পেছন ছেড়ো না। এরা আলাবিন-এর ঘাঁটিতে যাচ্ছে। তুর্কীদের হামলা ঠেকানোর জন্য এখান থেকে প্লভদিভ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর অনেকগুলো গোপন ঘাঁটি আছে বনের ভেতর। এ ছাড়া এ পথ দিয়ে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

রবিন বললো, 'আলাবিন কি শুধু সামরিক ঘাঁটি— না কোনও লোকালয় আছে?'

'আলাবিন একটা গ্রামের নাম। অনেক আগে কয়েক বার এসেছিলাম কাজে। তবে ঘাঁটিটা গ্রাম থেকে তিন চার মাইল দূরে।'

'আপনি চেনেন গ্রামের কাউকে?'

'শেষবার এসেছিলাম দশ বছর আগে, মার্কো কোঝিনকভের কাছে। এখনকার সমবায়ের পরিচালক। ভারি ভালো লোক।'

'আমরা তাহলে তাঁর কাছেই যাবো। নীল আর রিস্টোকে উদ্ধারের জন্য গ্রামের মানুষের সাহায্য লাগবে।'

'ভালো বলেছো। তোবারক, সোজা গিয়ে ডান দিকে ঘুরবে। দেখা যাক কোঝিনকভের দেখা পাওয়া যায় কিনা।'

কাঁচা উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে আলাবিন পৌছতে ওদের প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগলো।

মার্কো কোঝিনকভ বাড়িতেই ছিলেন। আন্তন আন্তনভের বয়সী, শ্লাভ চেহারা, একগাল সাদা দাড়ি। গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন তিনি। আন্তন নামতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন—'আরে, এ যে দেখি পুরোনো সেই ধাড়ি খরগোস আন্তন আন্তনভ। নিশ্চয় ঝিভকভের পতনের সংবাদ এনেছো!' বলে আন্তনের গালে চুমো খেলেন।

আন্তন হেসে বললেন, 'ঝিভকভের খবর কাল পাবে। আমরা বিপদে পড়ে এসেছি তোমার কাছে।'

কোঝিনকভের নজর পড়লো রবিন আর তোবারকের ওপর। আন্তন বললেন, 'আমার দুই তরুণ বন্ধু। ভেতরে চলো, সব বলছি।'

বুলগেরিয়ার গ্রামের সাধারণ বাড়ি যেমন হয়—পুরোটাই কাঠের, চিমনিটা শুধু পাথরের, ধোঁয়া উঠছে চিমনি থেকে। সদ্য রং করা হয়েছে, দেয়ালগুলো হালকা বাদামী রঙের, দোচালা ছাদের রঙ লাল। পেছনে সবজি বাগান তারপর বার্চ বন। ঝড়ের মাতামাতি কিছুটা কমলেও মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বন কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা ভেতরে গিয়ে বসার একটু পরেই কোঝিনকভ গিন্নি কফির সঙ্গে পনির আর সবজির গরম পিঠা দিয়ে গেছেন। রিস্টো আর নীলের ধরা পড়া, ইশতেহারের চিরকুট দেখে এ পর্যন্ত আসা— সব কথা শুনে কোঝিনকভ বললেন, 'আমি কয়েকবার গেছি আর্মির ঘাঁটিতে। খোঁজ নেয়ার জন্য লোক পাঠাতে হবে। জানতে হবে ছেলেরা এ ঘাঁটিতে আছে কিনা, চার্জেই বা কে আছে! তোমরা বরং আজ এখানে থেকে যাও। বিপদের সময় এ বুড়োকে মনে রেখেছো, খালি হাতে তোমাদের ফেরাবো না।'

'থাকতে আমার কোন আপত্তি নেই।' এই বলে আন্তন তোবারকের দিকে তাকালেন— 'তোমাদের কোন অসুবিধে হবে?'

তোবারক কথাটা রবিনকে বললো। রবিন আপত্তি করলো না— 'একবার টেলিফোন করে জানিয়ে দিতে হবে, নইলে চাচা টেনশনে থাকবেন।'

কোঝিনকভ বললেন, সারা গ্রামে একটাই টেলিফোন। সেটা আমার দফতরে। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার আগেই চলো টেলিফোনটা সেরে ফেলি।'

দূতাবাসে ফোন করলো তোবারক। নীলের বাবাকে ধরে লাইন দিলো রবিনকে। রবিন বাংলায় বললো, 'আমাদের কাজের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আশা করছি কালই নীলকে নিয়ে ফিরবো। আপনি রাতে প্রফেসরকে বলুন, জেনারেল ভাসিলিনকে তিনি যেন বলেন ওরা আলাবিন-এর সামরিক ঘাঁটিতে আছে।'

জিভকভের পতন এবং...

প্রফেসর ইয়াভরভ ভার্না থেকে সোফিয়া ফিরেছেন রাত দশটার দিকে। ততক্ষণে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। ভাগ্যিস দূতাবাসের শক্ত ল্যান্ড রোভারটা নিয়ে গিয়েছিলেন! নইলে রাতে আর ফেরা হতো না। ভার্না থেকে নীলের বাবার জন্য দারুণ খবর এনেছেন।

ঝিভকভকে সরাবার জন্য যে পার্টির বৈঠক চলছে এ খবর তিনি জানতেন। সিটিযেন কমিটির হাই কমান্ডের জরুরি বৈঠক বসেছিলো ভার্নায়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পার্টি যদি ঝিভকভকে সরাতে না পারে তাহলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। বৈঠকে কয়েকজন জেনারেলও ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার ঘন্টা খানেক আগে এলেন জেনারেল চোলপানভ, ঝিভকভের গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি চীফ। তাঁর আসার কথা ছিলো সকালে। না আসাতে অন্যরা বলাবলি করছিলেন চোলপানভ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না তো!

বৈঠকের ঘরে চোলপানভকে ঢুকতে দেখে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন। রিস্টোর বাবা ইঞ্জিনিয়ার গিয়র্গি বললেন, 'জেনারেল চোলপানভ নিশ্চয় সুখবরটি আনার জন্য দেরি করেছেন?'

গোল টেবিলের পাশে তাঁর জন্য রাখা চেয়ারে বসে চোলপানভ বললেন, 'আংশিক সুখবর এ মুহূর্তে দিতে পারি। চূড়ান্ত খবরের জন্য কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'আংশিকটাই আপাতত বলুন।' কয়েকজন একসঙ্গে জানতে চাইলেন।

'একটু আগে আমি ঝিভকভের গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান জেনারেল ভেলকভকে গ্রেফতার করে আমার নিজস্ব ঘাঁটিতে নিয়ে রেখে এসেছি।'

টেবিল চাপড়ে সবাই অভিনন্দন জানালো চোলপানভকে। প্রফেসর ইয়াভরভ বললেন, 'ওকে যে আমার কিছু ব্যাপারে জেরা করা দরকার।'

'নিশ্চয় করবেন।' জবাব দিলেন চোলপানভ—'কাল সকালে ওর কাছে আপনাকে আমি নিয়ে যাবো।' এর পর চোলপানভ বললেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের সর্বশেষ পরিস্থিতি।

সিটিযেন কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে বিকেল চারটার দিকে। কয়েকজনকে জরুরি কাজে আজই সোফিয়া ফিরতে হবে। বৈঠকের পর প্রফেসর ইয়াভরভ রিস্টোর বাবাকে

ডেকে বললেন, 'গিয়র্গি শোন, তোমার আর বাংলাদেশের এ্যাম্বাসাডরের ছেলেকে কালই আমি ছাড়াবার ব্যবস্থা করছি। শুনলে তো, গোয়েন্দা পুলিশের শয়তান চীফটাকে ধরা হয়েছে। ওই বলতে পারবে বাচ্চা দু'টোকে কোথায় রেখেছে। জেনারেল ভাসিলিনকে নিয়ে যাবো আমি।'

রিস্টোর বাবা বললেন, 'লিলিয়া আমাকে সকালেই বলেছে, মামা যখন এ কাজের ভার নিয়েছেন তখন আমাদের এ নিয়ে না ভাবলেও চলবে।'

'ভার তো নিতেই হবে বাছা। এ্যাম্ব্যাসাডরের ছেলেটা যে আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে এ খবর তো জানোই। আর রিস্টো ছাড়া আমার আপন কে আছে বলো!'

গভীর কৃতজ্ঞতায় প্রফেসরের হাত চেপে ধরলেন রিস্টোর বাবা। প্রফেসর বললেন, 'রিস্টোর মত ছেলের জন্য তুমি গর্ব করতে পারো গিয়র্গি।

'রিস্টো আপনারও ছেলে দিমিতির ইয়াভরভ।'

রিস্টোর বাবার কথা শুনে প্রফেসর ইয়াভরভের চোখে পানি এসে গেলো। ভাবলেন, আমেরিকায় নিজের কাছে রেখে ছেলেটাকে মনের মত করে গড়বেন।

বাড়িতে ফেরার পরই আমেরিকার রাষ্ট্রদূত প্রফেসরকে বললেন, 'বাংলাদেশের এ্যাম্ব্যাসাডর আপনাকে দুবার ফোন করেছিলেন। আমি বলেছি আপনি ফিরে এলে ওঁকে ফোন করবেন।'

'ফোন তো করতেই হবে। ওর জন্য ভালো খবর এনেছি আমি।' এই বলে প্রফেসর নীলের বাবাকে ফোন করলেন। 'এক্সেলেন্সি, ভার্না থেকে আমি এখনই ফিরেছি। আপনার জন্য একটা খবর আছে গোয়েন্দা পুলিশের চীফকে গ্রেফতার করেছে আমাদের লোক। কাল ওকে আমি জেরা করে জেনে নেবো বাচ্চারা কোথায় আছে।'

নীলের বাবা বললেন, 'রবিন আমাকে দুপুরে ফোন করেছিলো। বললো ছেলেরা নাকি আলাবিন-এর ঘাঁটিতে আছে। আজ রাতে রবিনরা ওখানেই থাকবে।'

'ঠিক আছে এক্সেলেন্সি, ওরা ওদের মত কাজ করুক। আমিও আমার মত করি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কালই আপনার ছেলে আপনি ফেরত পাবেন। ম্যাডামকে ভাবতে বারণ করুন।'

'ও আমার পাশে আছে। ওকে আপনিও বলুন।'

প্রফেসর নীলের মাকেও একই কথা বললেন। শেষে বললেন, 'এরকম সাহসী ছেলের জন্য পৃথিবীর যে কোনও মা গর্ব অনুভব করবে।'

'ধন্যবাদ প্রফেসর।' নীলের মা বললেন, 'আপনি ওদের জন্য যা করছেন আমরা সবাই সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'আমি এখনো কিছুই করি নি ম্যাডাম। ছেলেকে আপনার হাতে তুলে দেয়ার পর বলবো সামান্য কিছু করেছি। তবে আপনার ছেলে আমার জীবন বাঁচিয়েছে। যতদিন বেঁচে আছি মনে থাকবে।'

প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলার পর নীলের বাবা মা দু'জনই কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন। বাবা রীনকে বললেন, 'দু'দিন ধরে তো এক ফোঁটা ঘুমোস নি। এখন ঘুমোতে যা বুড়ি। তোর দাদা কালই এসে যাবে।'

বাইরে তখন তুমুল ঝড়। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ থাকলেও ঝড়ো বাতাসে মাঝে মাঝে ফ্রিডম পার্কে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এরই ভেতর আবার টেলিফোন বাজলো। দু'বার বাজতেই ফোন ধরলেন নীলের বাবা। ও পাশের গলা শুনে চমকে উঠলেন। রবিনের বাবা ফোন করেছেন।

'ভাইয়া তুমি কোত্থেকে ফোন করছো?'

'রোম থেকে। আজ বিকেলে এসেছি। নীলের খবর কী বল? নাফিসার ফোন পেয়ে আর থাকতে পারলাম না।' রবিনের বাবার গলায় উদ্বেগ।

'ওকে এদের গোয়েন্দা পুলিশ ধরে লুকিয়ে রেখেছে। আজই রবিনরা খবর পেয়েছে ওকে কোথায় রাখা হয়েছে। ওপর মহলে এ নিয়ে কাজ হচ্ছে। কাল আশা করছি নীল ফিরে আসবে।'

'রবিন কেমন আছে?'

'ভালো আছে, ওর জন্য ভেবো না ভাইয়া।'

'শোন, কাল বিকেলের ফ্লাইটে সোফিয়া আসছি। আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'চলে এসো ভাইয়া। নাফিসা আপাকেও বলো আসতে।'

রবিনের বাবা টেলিফোন রাখার পর গত তিনদিনে নীলের বাবার মুখে প্রথম হাসি ফুটলো। নীলের মাকে বললেন, 'ভাইয়া কাল আসবেন। নাফিসা আপাও আসতে আসতে পারেন। ভালোই হবে, কি বলো?'

মৃদু হেসে নীলের মা বললেন, 'ভালো হওয়ার অনেকটাই নির্ভর করবে রবিনের ওপর।'

আলাবিন-এর সামরিক ঘাঁটির কারাগারের দেয়ালগুলো চব্বিশ ইঞ্চি পুরু পাথর দিয়ে বানানো হলেও ভেতর থেকে ঝড়ের তান্ডব শুনতে পাচ্ছিলো রিস্টো আর নীল। সিলিং-এর সঙ্গে লাগানো কম আলোর বাল্‌বটা সন্ধ্যার পর দু'বার নিভে গিয়েছিলো। গত দু দিন একা থাকতে খুব খারাপ লেগেছিলো নীলের। রিস্টো আসার পর থেকে ভালো লাগছে ওর। যদিও রিস্টোর ওপর অত্যাচারের কথা শুনে ওর ভীষণ রাগ হয়েছিলো।

বিকেলে পালাবার প্ল্যান চূড়ান্ত করে ফেলেছিলো নীল। কোন এক বইতে পড়েছিলো— দু'জন বন্দীর একজন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করে খাটে শুয়ে চিৎকার করবে। প্রহরী ভেতরে ঢুকে যখন দেখতে যাবে তখন অপরজন ওকে মেরে অজ্ঞান করে বেরিয়ে যাবে। নীল লক্ষ্য করেছে রোজ রাতে রোগা পটকা একটা প্রহরী আসে খাবার দিতে। তাকে সামলানো এমন কোনো কঠিন কাজ হবে না ওর পক্ষে। আর অসুস্থ হওয়ার ভান করাটা রিস্টোর জন্যেও বেমানান হবে না। এখনো ওর শরীরে অসম্ভব ব্যথা।

রিস্টো এভাবে পালাবার পক্ষপাতী নয়। ওর ধারণা, একশ'র উপর চিরকুট ফেলেছে, কেউ না কেউ আসবেই ওদের উদ্ধার করতে। নীলকে বলেছে, 'এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? দু'এক দিনের মধ্যেই আমাদের নেয়ার জন্য লোক আসবে। সিটিযেন কমিটির সমর্থক এখানেও যে নেই তোকে কে বললো।'

দুই বন্ধুর অবস্থা এমন হয়েছে— একজন হতাশ হয়ে পড়লে আরেকজন সাহস জোগায়। রিস্টো এ ঘরে আসার পর নীল যেমন ওকে আশার কথা শুনিয়েছিলো।

ঝড় এসে নীলের প্ল্যান মাটি করে দিয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে যে ভীষণ ঝড় শুরু হয়েছে— নীল ভেবে দেখলো বেরিয়ে যাওয়াটা কম বিপজ্জনক হবে না। এই গভীর বনে ঝড়ের রাতে অন্ধকারে যাবেই বা কোথায়? রোগা পটকা প্রহরীটা যখন রাতের খাবার দিতে এলো তখন ওর দিকে কটমট করে তাকালো নীল। লোকটা ভাবলেশহীন মুখে রুটি আর খাবারের বাটি দুটো দরজার ফোকর দিয়ে গলিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

এই ক' দিনে কারাগারের খাবারে ওরা দু'জনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। রিস্টো অবশ্য বাড়িতেও এমন আহামরি কিছু খায় না, তবে নীলের কথা আলাদা।

খেতে খেতে নীল বললো, 'ঝিভকভের পর যখন তোদের সিটিযেন কমিটির সরকার হবে, তখন তুই কী করবি রিস্টো?'

রিস্টো হেসে বললো, 'আমার সেল-এ থাকতেই এ নিয়ে ভেবেছি আমি। বুলডগের মত যে শয়তান অফিসারটা আমাকে জেরা করেছে, ওকে সত্যিকারের বুলডগের চেইন গলায় দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে বেঁধে রাখবো। যে কদিন আমরা এখানে আটকা থাকবো সে কদিন ও বাঁধা থাকবে। মারধোর করবো না। শুধু চেইন বাঁধা বুলডগ হয়ে থাকতে হবে, ঘেউ ঘেউ না করলে খাবার পাবে না। এ ছাড়া বুলডগ আর যা যা করে সবই ওকে করতে হবে।'

রিস্টোর কথা শুনে গলা খুলে হাসলো নীল। বললো, সব কিছু করাটা কি সম্ভব হবে রিস্টো?'

'কেন হবে না?' হাসি চেপে নিরীহ গলায় বললো রিস্টো, বুঝেছি তুই কী বলতে চাইছিস। ঠিক আছে, ওকে একটা লাইটপোস্টোর সঙ্গেই বাঁধা হবে।'

এবার হাসতে গিয়ে বিষম খেলো নীল। রিস্টোও ওর সঙ্গে গলা মেলালো। বাইরে বড় দরজার কাছে যে যন্ডামত প্রহরীটা পাহারা দিচ্ছিলো, হাসির শব্দ ওরও কানে গেলো। উঠে এসে দরজার ফোকর দিয়ে দেখলো ছেলে দুটো হা হা হি হি করে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কড়া শাস্তি দেয়ার জন্য বন্দীদের এসব কারাগারে আনা হয়। ওর পঁচিশ বছরের চাকরি জীবনে এমন হাসির ঘটনা ঘটতে দেখে নি। ওর মনে হলো ছেলে দুটো বোধহয় বন্দী জীবন সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ও নিজের চোখে দেখেছে একটা ছেলেকে কী প্রচণ্ড মারই না মেরেছে! নীল আর রিস্টোর জন্য মোটাসোটা নিরীহ প্রহরীটার ভারি দুঃখ হলো। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ও নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

নীল বললো, 'তোর এই অভিনব শাস্তির কথাটা আমার ভাইকে বলতে হবে। ওরা আবার আমাদের দেশে আরেকটা ঝিভকভকে হটাবার জন্য লড়ছে কিনা! বুলডগ আমাদের দেশেও আছে।'

'হ্যাঁ সবগুলোকে এক সঙ্গে এক ধরনের শাস্তি দিতে পারলে ভালোই হয়।' বলে আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো রিস্টো। ভুলে গেলো ওর শরীরের ব্যথা আর বন্দি জীবনের অনিশ্চয়তার কথা।

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলো রিস্টো আর নীল। দেয়ালের ওপরে একটাই ছোট জানালা, সেটারও কাচ নামানো, তবু কোত্থেকে যেন কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিলো। দু'টো কম্বল গায়ে জড়িয়েও শীত তাড়াতে পারছিলো না ওরা।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বাইরে ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। কুঠুরির ভেতর এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে। হেমন্তের বার্চপাতার মত সোনালী রঙের রোদ। সকালের খাবার কখন দেয়া হয়েছে ওরা টের পায়নি। ঘড়ি দেখে নীল লাফিয়ে উঠে বসলো— 'সর্বনাশ আটটা বেজে গেছে। রিস্টো শিগগির খেয়ে নে। নইলে এখনই এসে খাবারগুলো নিয়ে যাবে।'

নীলের কথা শুনে হাসলো রিস্টো— 'তুই এমনভাবে বলছিস যেন গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে দারুণ ব্রেকফাস্ট এসেছে!'

কলের পানিতে মুখ হাত ধুয়ে ওরা খাবার নিয়ে বসেছে— তখনই প্রহরী এলো বাটি ফেরত নিতে। রিস্টো বললো, 'অপেক্ষা করতে হবে। খেয়ে নিই আগে। এমন ব্রেকফাস্ট বাপের জন্মেও খাই নি।'

সকালের প্রহরীটাকে নীলের ভালোই লাগে। কোনরকম হম্বিতম্বি করে না। রিস্টোর কথা শুনে বললো, 'যতক্ষণ খুশি খাও। বাইরে যে ভীষণ কাণ্ড!'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলো নীল।'

'আলাবিন থেকে কম করে হলেও হাজার খানেক মানুষ এসে আমাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেলেছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। বলছে তোমাদের দুজনকে না ছাড়লে ওরা হামলা করবে।'

খাবার ফেলে উঠে দাঁড়ালো নীল আর রিস্টো। দরজার কাছে এসে রিস্টো উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমরাই খবর পাঠিয়েছিলাম। ওরা সিটিযেন কমিটির সমর্থক।'

'ওদের সঙ্গে দুটো বিদেশী ছেলেও আছে। মনে হয় গ্রীক নয় ইটালিয়ান। একজন তো দারুণ বুলগেরিয়ান বলতে পারে।'

নীল বললো, 'নিশ্চয় রবিন আর তোবারক।'

রিস্টো জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের অফিসাররা কি করছে?'

'কি আর করবে! ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। বন্দি তো অনেক। মিটিং করছে। অপেক্ষা করছে সোফিয়া থেকে কেউ আসে কিনা। যাই ওদিকে, আবার কখন ডাক পড়ে!' এই বলে চলে গেলো নিরীহ প্রহরী।

রিস্টো নীলের দিকে তাকালো— 'মনে হচ্ছে ঝিভকভ আর গদিতে নেই।'

নীল কোন কথা না বলে বুকে জড়িয়ে ধরলো রিস্টোকে।

ঘাঁটির সদর দরজা পুরু লোহার পাত দিয়ে বানানো। ভেতর থেকে বন্ধ করে ফটকের ওপর উঠে গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলছে একজন অফিসার। ওর কোনও কথাই শুনতে চাইছে না গ্রামের লোকরা। আন্তন আন্তনভ তো রীতিমত গালাগালি শুরু করেছেন— 'তোরা ভেবেছিস কি শুয়োরের ময়লা খাওয়া উকুনের দল! তোদের বাপের মরার খবর আসার জন্য অপেক্ষা করছিস নাকি রে নর্দমার পোকারা.....'

কয়েকজন কুড়াল দিয়ে বার্চ আর পাইন গাছ কাটছে মই বানিয়ে দেয়াল টপকাবে

বলে। সকাল তখন সাড়ে নটা। আকাশে মেঘের কোনও চিহ্ন নেই। হেমন্তের ঝলমলে রোদে চকচকে করছে বার্চবন। গাছের নিচে ঝরাপাতার সোনালী কার্পেট বিছানো। সেই কার্পেটের ওপর দিয়ে দু'টো গাড়ি আসতে দেখলো গ্রামের লোকেরা। দুটো গাড়িতেই পতাকা উড়ছে। একটাতে আমেরিকার পতাকা, আরেকটাতে বাংলাদেশের। সবাই একসঙ্গে হই হই করে ছুটলো সেদিকে।

সবার সঙ্গে ছুটে গেলো রবিন আর তোবারক। দুই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামলেন প্রফেসর ইয়াভরভ, জেনারেল চোলপানভ আর জেনারেল ভাসিলিন। জেনারেল চোলপানভ পুরো ইউনিফর্ম পরা। তিনিই এগিয়ে এলেন সবার আগে। ফটকের কাছে এসে ধমকের গলায় বললেন, 'দরজা খোলো।'

ফটকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারটি জেনারেলকে না চিনলেও কাঁপতে কাঁপতে এসে দরজা খুলে দিলো। জেনারেল বললেন, 'এখানকার দায়িত্বে কে আছে, ডাকো তাকে।'

প্রফেসর ইয়াভরভ আন্তন আন্তনভকে বললেন, 'গ্রামের লোকদের আপনি সামলান। সব বন্দিকে এখনই আমরা মুক্ত করবো।' এরপর তোবারক আর রবিনকে চোখ মটকে বললেন, 'আমি জানি এসব কাদের কাজ।'

দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জেনারেল চোলপানভকে চিনতো। ভয়ে তার মুখের রঙ বদলে গেছে। জেনারেল বললেন, 'বন্দিদের সবাইকে আমি নিয়ে যাবো। এক্ষুণি তালিকা তৈরি করো।'

প্রফেসর ইয়াভরভ সবার আগে গেলেন রিস্টো আর নীলের সেল-এ। দরজা খুলে দিতেই তিনি দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুই রাষ্ট্রদূত অপেক্ষা করছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের দফতরে। দুই বগলে দুই বন্দীকে চেপে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। নীল ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওর বাবাকে। ক্লান্ত গলায় বাবা শুধু বললেন, 'ভালো আছিস বুড়ো!'

সবাই মিলে যখন বাইরে এলো নীল আর রিস্টো তখন গ্রামের মানুষদের কাঁধে। ভিড় ঠেলে ওদের উদ্ধার করতে গিয়ে হিমসিম খেলো রবিন, তোবারক আর আন্তন।

জেনারেল চোলপানভ থেকে গেলেন অন্য বন্দিদের সঙ্গে করে আনবেন বলে। বন্দিরা প্রায় সবাই সিটিযেন কমিটির নেতা। রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে চললেন জেনারেল ভাসিলিন আর প্রফেসর ইয়াভরভ। ওঁরা আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে উঠেছেন। আন্তন আন্তনভকে আসতে দেননি তাঁর পুরোনো বন্ধু কোঝিনকভ। নীলদের গাড়িতেই সোফিয়া এলো রিস্টো।

আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের গাড়ি নীলদের বাড়িতে প্রথম থামলো। রাষ্ট্রদূত নীলের বাবাকে বললেন, 'এক্সেলেন্সি, আশা করি আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।'

প্রফেসর বললেন, 'ম্যাডামের কাছে একটা ভোজ পাওনা রইলো। আমাদের এক্ষুণি যেতে হবে এক জরুরি মিটিং-এ। রিস্টো, তুই নীলের কাছেই থাকিস। বাড়ি থেকে কোথাও বেরোবি না। শহরের অবস্থা ভালো নয়।'

সোফিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ হতে পারতো, কিন্তু হয় নি। সেদিন দুপুরে রেডিওতে বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট টডর ঝিভকভের পদত্যাগের সংবাদ ঘোষণা করা

হলো। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন কমিউনিস্ট পার্টিরই পিটার ম্লাদেনভ।

খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘর, অফিস, দোকান সব কিছু ফেলে রাস্তায় নেমে এলো হাজার হাজার মানুষ। বয়সের কোনও সীমা নেই। সাত মাসের বাচ্চা থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বুড়োরাও শামিল হলো আনন্দ উৎসবে। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে বুড়োবুড়িরাও মদ খেয়ে নাচলো, গাইলো, মাতাল হয়ে একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, বেলুন ওড়ালো। আনন্দের স্রোতে সাইবেরিয়ান হাঁসের মত ভাসতে লাগলো সোফিয়ার মুক্ত মানুষ।

নীল আর রিস্টো বাড়িতে এসে এক ঘণ্টা কাটিয়েছে বাথরুমে। ওদের ধারণা তিন দিনে মণ খানেক ময়লা নাকি জমেছে ওদের শরীরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে এম্ব্যাসির ডাক্তার অপেক্ষা করছেন রিস্টোকে দেখার জন্য। দেখে শুনে কিছু ওষুধ দিলেন তিনি। বললেন, 'দুজনের জন্য সবচেয়ে ভালো ওষুধ হচ্ছে দু'গ্লাস দুধ খেয়ে লম্বা একটা ঘুম।'

নীল গল্প করতে বসেছিলো। মা জোর করে ওকে পাঠিয়ে দিলেন ঘুমোতে। যাওয়ার আগে নীল ওর বাবাকে বললো, 'শিগগির তোমার সেক্রেটারিকে তাড়াও বাবা। ইলিনা মিরকোভাই হচ্ছে গুপ্ত পুলিশের গোয়েন্দা।'

বিকেলে রবিনের জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো এয়ারপোর্টে। বাবাকে আনার জন্য চাচার সঙ্গে এয়ারপোর্ট এসেছে। বাবা সোফিয়া আসছেন শোনার পর থেকেই দারুণ উত্তেজিত ছিলো সে।

চাচা ওর জন্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন এয়ারপোর্টের একেবারে ভেতরে। ঘোষণা করা হলো বলকান এয়ার রোম থেকে সোফিয়া এসে ল্যাণ্ড করেছে। ওরা ইমিগ্রেশন কাউন্টারের পাশে সোফায় বসে অপেক্ষা করছিলো। সঙ্গে তোবারকও রয়েছে। যাত্রীদের লাইনে প্রথমে বাবাকে দেখে ছুটে গেলো রবিন। বাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেখেছিস কে এসেছে!'

পেছনে তাকিয়ে দেখে নাফিসা আন্টি। উচ্ছ্বসিত গলায় রবিন চিৎকার কলে উঠলো— 'আন্টি আপনি এসেছেন! আমি যে কী খুশি হয়েছি— '

বাধা দিয়ে নাফিসা বললেন, 'একটু খুশি আর কারো জন্যে রাখো রবিন।'

'আরে এ কে! পলা তুমি!'

রবিন ভেবেছিলো পলা হাত মেলাবে। হাসি মুখে হাত বাড়ালো সে। সবার সামনে ওকে জড়িয়ে ধরলো পলা— 'ওহ রবিন! তোমার ভাই হারিয়ে গিয়েছিলো। তুমি ওকে খুঁজতে বেরিয়েছো। শোনার পর থেকে আমি ঘুমোতে পারি নি।'

নাফিসা বললেন, 'খুব খারাপ কথা রবিন, পলা এত কান্নাকাটি করেছে যে— না এনে পারলাম না।'

রবিন কী বলবে! লজ্জায় ওর কানটান এরই মধ্যে লাল হয়ে গেছে। তোবারকের মুখ টিপে হাসা ওর নজরে পড়েছে। কি মিটমিটে শয়তান ও! বাবা, চাচা সবাই রয়েছেন— আবার চোখও টিপছে! ভাগ্যিস নীল আর রীন আসে নি! পলা যদি ওর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে— রবিনের কি দোষ!